শক্তি কেমন বিকশিত হইতেছে। যেটীকে যে ভাবে সেব্য করিলে, তাহার আনন্দ হয়, তাহার উল্লাস হয়, তাহার ক্রম-বিকাশ হয়, এই শক্তি উদ্ভিদের মধ্যে রসময়ী রূপে সঞ্চারিতা হইয়া তাহাই করিয়া দিতেছেন। গোলাপটিকে মধুর, কণ্টকটিকে সুতীক্ষ্ণ—পত্রটিকে কোমল, কাণ্ডটিকে কঠিন—অর্থাৎ আর যেটি উপযোগী, যে অবস্থায় থাকিলে যে সহায়তা আবশ্যক, তাহাই করিয়া দিতেছেন। কৃপাময়ী এমনি করিয়া জড়-জগতের সেবায় যে নিয়োজিতা রহিয়াছেন—সাধক তাহা প্রত্যক্ষ করেন আর তদ্গত-চিত্তে বলিতে থাকেন—

"ওঁ আবিরাকীর্ণ এধি—"

"জ্যোতির্ম্ময়ী মাতা হও আবির্ভূতা—"

এ সেবা কেন? সমগ্র বিশ্বে এই যে মধুর লীলাখেলা চলিতেছে—ইহার উদ্দেশ্য কি—ইহার অন্তরালে কি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে? একবার যদি প্রকৃতি পাঠ কর, উন্মুক্ত চক্ষে স্থির-চিত্তে বিশ্ব-প্রকৃতি পানে চাহিয়া দেখ, তবে শ্রীমহাপ্রভুর অমিয় বাণী, হৃদয়ে তখনই ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিবে—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন,
এর চেয়ে ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

—

পৌরাণিক প্রথা।

আজকাল বঙ্গদেশের প্রত্যেক সমাজ মধ্যে পাশ্চাত্য-প্রথা প্রবিষ্ট হইয়া বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারীকেই আচ্ছন্ন করিয়াছে। তাহার ফলে বাঙ্গালার অথবা ভারতের পৌরাণিক প্রথা সকল লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, আর যাইতেছেই বা বলি কেন, ক্রমে ক্রমে ভারতীয় পৌরাণিক প্রথা সকল পাশ্চাত্য-প্রথার তীব্র তুষারাবৃত হইয়া চিরদিনের মত চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এই তুষার অপসারিত করিয়া, ভারতীয় পৌরাণিক প্রথা সকলকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে, তীব্র সূর্য্যালোকের আবশ্যক। সমাজ-বন্ধন,সভা-সমিতি বা জাতিগত অথবা লোকগত চীৎকারে আজকাল আর কেহ কর্ণপাত করিবে না, এমন কি, পুরাতন প্রথা পুনরুত্থাপিত করিবার কথা কোন কাগজে লিখিত হইলে সে কাগজ পর্য্যন্ত অপাঠ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ভারতের এমনই দুরদৃষ্ট যে, পুরাতন মুনি-ঋষিদের মত, বাপ-পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মত, সমাজে আজকাল ব্যবহৃত হইলে অথবা কেহ সেই প্রথার কিঞ্চিন্মাত্রও অবলম্বন করিলে তাহাকে অসভ্য "ভেতো" বাঙ্গালী বলিয়া আবার বাঙ্গালী বাবুরাই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের কথা অথবা দুরদৃষ্টের কথা কি হইতে পারে?

যাঁহাদের বাপ-পিতামহ পিতৃপুরুষগণ ৩॥০ হাত ধুতি পরিধান করিয়া, সামান্য ছিটের আংরেখা ও বোম্বাই অথবা দেশী মোটা সুতার কাপড় দ্বারা প্রস্তুত চাদর দ্বারা শীত নিবারণ করতঃ পরের দাসত্ব স্বীকার না করিয়া, ঋণগ্রস্থ না হইয়া, এক কথায় "অঋণি-অপ্রবাসী" হইয়া মানব-সমাজে, লোক-সমাজে মানুষ বলিয়া

পরিচিত থাকিয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে, নিরোগে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাঁহাদেরই বংশধরেরা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, সেই সমস্ত সদাচারকে অসভ্য রীতি ও অসামাজিক-নীতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, ইহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা হইতে দেশের দুর্দ্দিন আর কি হইতে পারে? আরও বলি—যে দেশের রমণীরা জীবনেও কালী-কলমের সহিত সংস্রব না রাখিয়া, অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থাতেও পুত্র-পুত্রবধুর সম্মুখে, স্বামীর সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন, সেই দেশের রমণীরা—তাঁহাদেরই বংশধর-রমণীরা আবার আজকাল উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক স্বামী অন্তে অকাতরে অপর স্বামী গ্রহণ করিয়া পুত্র-কন্যার মাতা হইয়া সংসারী হইতেছেন, ইহা হইতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? দুরদৃষ্ট ভারত! এখনি তোমার এই অবস্থা, না জানি, তোমার পরিণাম আরও কত ভীষণ।

আজকাল এই সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য রীতি-নীতি, পাশ্চাত্য-প্রথা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ভারতীয় নরনারীগণ ভ্রষ্টাচারী হওয়াতে ভারতের আজ এই দুরবস্থা। যদি বলেন—"কিসের দুরবস্থা, ভারতীয় লোক ত মহাসুখী।" তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই যে,—"পূর্ব্বকালের লোকগণ দাসত্ব করিতেন না, এখনকার লোকগণ যদি তদপেক্ষা সুখী অথবা তদনুরূপ সুখী, তবে দাসত্ব কেন করা হয়?" যদি বলেন,—"চাকরী করা বড়লোক হওয়ার জন্য—মানের জন্য।" তবে সে স্থলে আমি বলিব যে,—"চাকরী অথবা দাসত্ব করিয়া ভারতের কয়জন লোক বড়লোক হইয়াছেন, আর চাকরীতে যে কি মানোন্নতি হয়, তাহা—যাহারা চাকরী করেন, তাহারাই মনে মনে বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রে আছে,—যার যে কার্য্য নয়, তিনি তাহা করিলেই জাতিভ্রষ্ট হইবেন। সে অবস্থায় যিনি স্বধর্ম্মোচিত কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্য করেন, তিনিই জাতিভ্রষ্ট। অতএব জাতিচ্যুত হইয়া বড়লোক হওয়ার কি দরকার, আর ভ্রষ্টাচারীর মানোন্নতিই বা কোথায়,—তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। পাঠকগণ, তাহা বুঝিয়া দেখিবেন?

ভারতের এ দুরবস্থা মোচন করিবার আর কোন উপায় নাই। ভারত চিরদিনের মত দুঃখের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। ভারতের আজ কি দুর্দ্দিন তাহা ভারতবাসী লোক মাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম সহকারে পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া কোন মতে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাঁহারা বড়লোক অথবা ধনী আছেন, তাঁহারাও অচিরেই দারিদ্র্যের হস্তে পতিত হইবেন,সন্দেহ নাই। কারণ, দেশে—বিদেশীয় পণ্য, বিদেশীয় শিল্প—এমন কি,ভারত আজকাল দুর্দ্দিনের এরূপ চরম সীমায় অবতরণ করিয়াছে যে, বিদেশী জিনিষ না হইলে, ভারতবাসী লোকের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোন উপায় নাই। পাশ্চাত্য জাতিগণের বুদ্ধি বৃত্তিকে আমি শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যাপারের এমন একটী কৌশল বাহির করিয়াছে

যে, এ দেশের লোক সে কৌশল কখনও ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না। তবে ভারতের আর দুরবস্থা মোচনের উপায় কোথায়? দুরবস্থার চরমসীমায় ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিতে করিতে যখন শেষ সীমায় উপনীত হইবে, তখন ভারতের নাম, জগত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

যদি সমাজে পূর্ব্বপ্রথা সকল পুনরুজ্জীবিত করা যায়, তবে ভারতের সুদিন আসিলেও আসিতে পারে। নচেৎ আর কোনও সভা-সমিতিতে ভারতে কোন ফলোদয় হইবে না। ধ্বংস নিশ্চয়!

তাই বলি, ভারতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে বাপ-পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রথা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল প্রথা আজ-কাল যাঁহারা পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিবেন এবং পারিবেন, তিনিই ভারতের শুভানুধ্যায়ী, অন্যথা যিনি যাহা করুন, তাহাতে ভারতের পক্ষে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে বিষময় ফল ফলিবে। কদাচ ইহার অন্যথা হইবার নহে।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

বর্ত্তমান কর্ম্ম-যুগ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং ভারতীয় সভ্যতায় পার্থক্য অনেক অধিক। যে জাতি চরিত্রকে প্রধান বলিয়া গ্রহণ করে, তাহার সভ্যতা এক প্রকার—এবং যে জাতি বৈষয়িক লাভকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাহার সভ্যতা আর এক প্রকার। এই কারণেই ভারতে ঋষি, সাধু এবং ত্যাগী ব্যক্তির এত আদর এবং সম্মান, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ সকলে কলাকুশল এবং ধনী ব্যক্তিরই আদর অত্যন্ত অধিক। এই সকল কারণেই পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন মানুষের বৈষয়িক সমৃদ্ধির কথা কহিতেই ব্যস্ত, কিন্তু আর্য্য সাহিত্য-দর্শন মানবের আত্মা এবং অন্তরের কথা লইয়াই একেবারে তন্ময়। উপস্থিত সময়ে ভারতীয় সাহিত্য-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা এক-প্রকার বন্ধ হইয়া যাওয়ায়—এবং পাশ্চাত্যেরা আমাদের নিকট আমাদের সাহিত্য-দর্শনের অযথা নিন্দা সদাসর্ব্বদা করিতে থাকায়, আমরা পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি কিছু অধিক ঢলিয়া পড়িয়াছি; *কিন্তু এই প্রকার ঢলিয়া পড়ায়* আমাদের শুভ নাই, কেননা এই পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা আমাদের বাহিরের সমৃদ্ধিলাভ হইলেও আমাদের অন্তর্নিহিত যে সকল দেববৃত্তি আছে তাহাদের মুক্তিলাভ হয় না, তাহারা হৃদয়ের অন্ধকারেই চিররুদ্ধ থাকিয়া যায়। আমাদের কর্ম্মের একটা উদ্দেশ্য আছে, সে উদ্দেশ্য ইহাই—যে আমরা কর্ম্মের দ্বারাই আত্ম-শক্তিকে জাগাইয়া পরার্থে নিয়োজিত করিব, একটী ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে বেষ্টন করিয়া শক্তিকে কুণ্ঠিত কিম্বা কলুষিত করিব না বরং বৃহৎ ব্যক্তিত্বে তাহার অস্তিত্বকে নষ্ট করিয়া দিয়া বৈরাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিব। পাশ্চাত্য দেশে কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সেখানে পরের সেবায় বাঁচার কোনও সার্থকতা নাই, সেখানে দশজনকে পিসিয়া, হটাইয়া, বাঁচাই হইল বাঁচা। আমরা বুঝি অক্ষমকে রক্ষা করিয়া শক্তির পরি-চয় দেওয়া। তাহারা বুঝে অক্ষমকে দলন

করিয়া শক্তির পরিচয় দেওয়া। আমরা বলি মানুষকে সেবা-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। তাহারা বলে মানুষকে যোগ্যতালাভ করিতে হইবে। এইস্থলে মনে রাখা উচিত এই যোগ্যতার অর্থ কিছু স্বতন্ত্র, ঠিক যোগ্যতার যাহা অর্থ হওয়া উচিত তাহা নয়। যে কারণেই হউক পাশ্চাত্যদের অদম্য উদ্যম, দুর্ণিবার অধ্যবসায়, অমিত সাহস, প্রভূত বল, বিপুল বীর্য্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে যে এক প্রকার শুষ্ক নৈরাশ্য এবং জীবনের প্রতি অরুচি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার বিষয় আমরা ভাবি না—এবং কেন যে এইপ্রকার হয় তাহার বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখি না। সেখানে মানুষে মানুষকে অবিশ্বাস করে। মানুষমাত্রই বিশ্বাসঘাতক, স্ত্রীমাত্রই বিশ্বাসের অযোগ্যা কেন না স্ত্রীলোক-মাত্রই বিলাসের ক্রীড়ণক। পাশ্চাত্য দেশে লোকে স্ত্রীলোকের গোলামী করিতে ভালবাসে এবং তাহাতে যথেষ্ট বাহাদুরি আছে জানে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে এবং দেবী-বোধে পূজা করিয়া আমরা মনের পবিত্রতা লাভ করি। তাহারা স্ত্রীলোকের গোলামী করিয়া জীবন সার্থক মনে করে। আমরা স্ত্রীলোকের পূজা করিয়া আত্মিক বল লাভ করি। আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে এতটা প্রভেদ। সত্য কথা বলিতে হইলে মানুষের মূল্য যে কত তাহা তাহারা মোটেই জানে না। আমাদের দেশে পিতা, মাতা, গুরু প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণকে পূজা করা হয়, তাহাদের দেশে শুধু খাতিরই করা হয়, পূজা করা তাহারা মহাপাপ বলিয়া মনে করে। এই সকল কারণেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি আমাদের আদর্শ অবলম্বন করিয়া আমরা ঠিক দেবতার মত জাতি হইতে পারি না। তাহাদের আদর্শই যে বিপরীত। আমরা উৎসব করি কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, তাহারা উৎসব করে—মদ্যপান এবং মাংস ভক্ষণ করিয়া। সকল বিষয়েই আমাদের আদর্শ ভিন্ন প্রকারের।

বাহিরে আমরা যে প্রকার—ইউরোপীয়েরা কিন্তু বাহিরে সে প্রকার নহে। বাহিরে আমরা নগ্ন; তাহারা পোষাক-পরিচ্ছদে ঢাকা। ভিতরে আমরা এক প্রকার; তাহারা আর এক প্রকার। আমাদের আশা এবং চিন্তা যেরূপ, তাহাদের আশা এবং চিন্তা সেরূপ নহে। আমরা ভক্তি, পূজা এবং ধর্ম্ম-ভাবের দ্বারা মনকে গড়িয়া তুলিতে চাহি,—তাহারা লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা মনকে গড়িয়া তুলিতে চাহে। আমরা সকল বস্তুতে ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করি—তাহারা সকল বস্তুতে তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর সম্ভাবনা দেখে। প্রকৃতি আমাদের মাতৃস্থানীয়া—তাহাদের কিন্তু সেবিকা-স্বরূপা। প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিলে আমরা ভক্তিতে গদ্গদ হই—তাহারা প্রকৃতির বিষয় যথাযথ অবধারণ করিয়া তাঁহাকে আপনাপন প্রয়োজন সিদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া লয়। আমাদের নিকট ভগবান "চিদানন্দ রূপ শিবোঽহং শিবোঽহং"—তাহাদের নিকট তিনি কেবল তাঁহাদেরই মুক্তি-বিধাতা, ত্রাণ-কর্ত্তা এবং অপরাপর সকল লোকেরই নরকে নিক্ষেপ-কর্ত্তা। তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে এত অধিক পার্থক্য থাকার কারণ, আমাদের সম্মুখে যে কর্ম্মযুগ উপস্থিত থাকিয়া আমাদের মুখের দিকে সোৎসুকভাবে তাকাইয়া আছে, তাহার রূপে এবং ইউরোপীয় কর্ম্মযুগের রূপে মোটেই মিল খায় না। আমাদের মায়ের যে আহ্বান তাহা আমাদের জন্য—তাহার ভাষা স্বতন্ত্র, অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র, তাহার মধ্যে যে স্নেহটুকু মাখান আছে তাহাও স্বতন্ত্র। বিলাতের করুণা-দেবী কিন্তু আমাদের মাতা নহেন—তাহার আহ্বানও সেইজন্য মায়ের ডাক নহে। তাহার মধ্যে দয়া নাই, প্রাণের মমতা নাই—একটু আধটু কৃপা থাকিতে পারে। তাহাদের কর্ম্ম-যুগের সহিত আমাদের কর্ম্মযুগের তুলনা করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না—মায়ের স্নেহের আমার তুলনা কি?—ইহা যে অতুলনীয়। আমাদের বর্ত্তমান, অতীতের পলিতে পলিতে আকারপ্রাপ্ত। আমাদের জীবনের মধ্যেও আমাদের একটি অত্যন্ত আপনার ভাবচাবি বস্তু

আছে—তাহার সন্ধান আমরা নিজেই জানি না। কিন্তু যদি আমরা প্রাচীন আর্য্য-গৌরবের বিচিত্র কথাসকল একবার বুঝিবার চেষ্টা করি এবং অতীতের দিকে একবার ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে আমাদের এই গুপ্তঘরের চাবি খুলিয়া যায় এবং আমরা একেবারে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি—কোথায় থাকেন আমাদের প্রাণের আরাধ্যা "ভুবন-মনমোহিনী।" সে সৌভাগ্য আমাদের আছে। বর্ত্তমান কর্ম্মযুগ তাহা বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিতেছে। আমরা কেবল আলস্য এবং ঔদাসিন্যের জন্য সেই ভাগ্যদেবীকে আবাহন করিতে পারিতেছি না।

পিতামাতা সন্তান-সন্ততিতে জীবিত, পূর্ব্ববর্ত্তী স্রোত পরবর্ত্তী স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত না হইলে তাহার মিলন পরিপূর্ণ হয় না। সেইরূপ পুরাতন নূতনকে গঠন না করিলে তাহা ভালরূপ গঠিত হইতে পারে না। পুরাতন দেখিয়া যে নূতন গঠন করিতে পারে, তাহারই জীবন সার্থক। আমরা যে পুরাতন কিছু নহে বলিয়া ছাড়িয়া দিতেছি, তাহা আমাদের ভ্রম। বর্ত্তমান কর্ম্মযুগে পুরাতনভাবে নূতনের গঠন করিলেই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ হইবে—ব্যর্থতা যে অনিবার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কলিকাতা একালের ও সেকালের। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পি,এম বাগচী কোম্পানীর দ্বারা ১৬নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা মাসুল ১৲টাকা। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে হরিসাধনবাবুর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। ইতিহাস লিখিতে যে তিনি সিদ্ধহস্ত, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কলিকাতার সেকাল ও একালের ইতিহাস লিখিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সকল ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইতিহাস-প্রিয় পাঠকের নিকট ইহার যথেষ্ট আদর হইবে এরূপ আশা করা যায়। ভাষা বেশ সরস ও প্রাঞ্জল। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য পুস্তকে বহু হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে। আমরা সকলকে ইহার এক এক খণ্ড গৃহে রাখিতে অনুরোধ করি।

বিজন-বিজয়া কাব্য।—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবিশ প্রণীত। মূল্য ॥০। গ্রন্থকার স্ত্রীর অকাল মৃত্যু জনিত দুঃখের মর্ম্ম-গাথা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে কবিতার ভাব বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। যাহা হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বাহির হইয়াছে, তাহা যে হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কাগজ ও ছাপা ভাল। হাওড়া, শিবপুর, নন্দিনী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

মিলনের পথে।—শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার মল্লিক প্রণীত। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব কবিকৌমুদী কর্ত্তৃক, পোঃ বেলগাছিয়া কুণ্ডুর লেন "সুহৃদ-কুটীর"হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৶০ আনা। জগতে আসিয়া মানুষ কি চায়, কোন দিক তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত, এখানে আসিয়া কাহার সহিত মিলিত হইলে তাহার মিলনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আর তাহাকে যাতায়াতের বৃথা কষ্টভোগ করিতে হইবে না। ছেলে মায়ের ক্রোড়ে স্থান পাইয়া ধন্য হইবে। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে ইহাই বেশ সুন্দর রূপে বুঝাইয়াছেন। গ্রন্থকার সাহিত্য-সেবায় নূতন ব্রতী হইলেও তাঁহার ভাষা বেশ মাধুর্য্যময়ী এবং লিখিবার শক্তি তাঁহার বেশ জন্মিয়াছে। তাঁহার "মিলনের পথে"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি—তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের এরূপ সুন্দর তত্ত্ব সকল সরল ও সহজ ভাষায় সাধারণের গোচর করিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার করুন।



মৃত-পতি ক্রোড়ে বেহুলা।

প্রকৃতি তত্ত্ব—জীব-রাজ্য।

এই সৃষ্টি প্রকাশের প্রধান পদার্থ জড়। জড় ভিন্ন সৃষ্টি প্রকাশ হইত কি না, কে বলিবে। জড়ের যে অংশ আর বিভাগ করা যায় না, সেই সূক্ষ্মতমাংশ অণু। এইরূপ অণুময় পদার্থই জড়। ইহা অচল, নিশ্চল, বিভাজ্য, আকার ও রূপবিশিষ্ট, চৈতন্যহীন, আকর্ষণ ও বিকর্ষণযুক্ত। ইহা অপ্রাণ না সপ্রাণ—ইহা বিচার্য্য। প্রাণ বা জীবনীশক্তি শক্তির উন্নততর বিকাশ। যদি বিচার করিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে সৃষ্টি বিকাশের মৌলিক উপাদানই শক্তি। এই শক্তি হইতেই অণুর উদ্ভব। তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে শক্তিই সৃষ্টি প্রকাশের প্রধান, আদি ও মৌলিক উপাদান। এই বিশ্ব শক্তিময়। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই শক্তির কার্য্য লক্ষিত হয়। শক্তি বিরহিত কোন পদার্থ নাই। যে পদার্থ শক্তি বিরহিত হইবে, তাহার সত্ত্বা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হইবে। শক্তিহীন হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র কোন পদার্থ অবস্থান করিতে পারে না।

স্বর্গীয় হার্বার্ট স্পেনসার ইংলণ্ডের একজন প্রধান দার্শনিক। তিনি অজ্ঞেয়তাবাদ প্রচারক। সৃষ্টিমধ্যে শক্তির অভাবনীয় ও বিস্ময়কর কার্য্য দেখিয়া তিনি শেষ জীবনে মহাশাক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, শক্তিই সৃষ্টির প্রধান ও মৌলিক উপকরণ। যদি শক্তির অভাব হয়, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যায়। তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, জড় বিশ্ব প্রকাশের আদি উপাদান নহে। ইহা মৌলিক পদার্থও নহে, ইহা শক্তিসম্ভূত। শক্তির উচ্চতর বিকাশ প্রাণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। যখন দেখা যায় জড় শক্তিময়, তখন ইহা প্রাণ শূন্য নহে, এরূপ বোধগম্য হওয়াও অসম্ভব নহে। জড় প্রাণময়, অধুনা বিজ্ঞান জগতের সিদ্ধান্ত। তবে জড়ে অতি নিকৃষ্টভাবে জীবনীশক্তির বিকাশ। আমরা যত উর্দ্ধে উঠি, যত উচ্চতর প্রাণময় পদার্থদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তত ইহার জটিল, কুটিল, অসরল এবং দুর্ব্বোধ ভাব অবলোকন করি। জড়ে ইহা সহজ বোধগম্য। জড় যে জীবনীশক্তি বিরহিত নহে,ইহা প্রাণযুক্ত পদার্থের সহিত ইহার তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। জীবনীশক্তির কিছু লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় বলিয়া ইহা প্রাণময় রূপে প্রমাণীকৃত, ইহাতে সংশয় থাকিতে পারে না।

জড় আকর্ষণ ও বিকর্ষণযুক্ত। ইহা প্রাণময় পদার্থের এক লক্ষণ। জড় এই আকর্ষণী শক্তি দ্বারা নিকটবর্ত্তী ভৌতিক পদার্থকে

আকর্ষণ করে এবং ইহার অন্তর্নিহিত এক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা ইহা আপনার সত্ত্বা রক্ষা করে। ইহাই মাধ্যাকর্ষণ। বৰ্দ্ধনশীলতা জীবনের আর একটী লক্ষণ। জড়পিণ্ড সমূহ ক্রমশঃ স্ব স্ব স্তরে বৰ্দ্ধিত হয়, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির করিয়াছেন। প্রস্তরখণ্ড যে বৰ্দ্ধিত হয়—তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। প্রস্তর অতি কঠিন পদার্থ। সহজে ভঙ্গ হয় না। কিন্তু প্রস্তর সমূহ মধ্যে এরূপ প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা আর বাড়ে না এবং অল্প আঘাতে ভঙ্গ হইয়া যায়। ইহা মরা পাথর বলিয়া খ্যাত। ইহা কোন কারণ বশতঃ জীবনী-শক্তি হীন হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তবেই যখন সপ্রাণ পদার্থের দুই একটী লক্ষণ ইহাতে পরিলক্ষিত হইতেছে, তখন ইহাকে অপ্রাণ বলা যায় না। পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে—জড়ে অতি নীচ ও অতি নিকৃষ্টভাবে জীবনীশক্তির বিকাশ। তাহা হইলে ইহাতে জীবনের সমস্ত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। প্রাণের দুই একটী লক্ষণের সহিত ইহার লক্ষণ সমান পরিদৃষ্ট হইলে ইহা অপ্রাণ নহে, ইহাই প্রামাণিক।

এক্ষণে দেখা গেল এই সৃষ্টি প্রকরণে জড় আদি ও প্রথম পদার্থ। স্রষ্টা প্রথমে জড় সৃষ্টি করিয়া সেই উপাদানে বিশ্ব বিকাশ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে পর পর সৃষ্টিতে যে সকল পদার্থের প্রকাশ হইয়াছে, দেখা যায় সমস্তই জড়ময়। জড়ের পর কোন্ পদার্থের প্রকাশ হইয়াছে—এক্ষণে দেখা যাক্। জড়ের পর উদ্ভিদের প্রকাশ বা সৃষ্টি ইহা স্বভাববেত্তা, পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন।

তাহাদিগের এই মীমাংসা অযৌক্তিক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জীবনীশক্তির ক্রমোন্নতি ইহার প্রমাণ। জড়ে ইহা অতি হীন, নীচ ও নিকৃষ্টভাবে প্রকাশিত দেখা গিয়াছে, কিন্তু উদ্ভিদ রাজ্যে তদপেক্ষা প্রাণের উন্নত ভাব ও লক্ষণ লক্ষিত হয়। যদিও উদ্ভিদরাজ্যে জীবনীশক্তি অপূর্ণ, তথাপি সে রাজ্যে ইহার প্রকাশ অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর ও উৎকৃষ্টতর। উদ্ভিদে জীবন্ত ভাব জড়ের অপেক্ষা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। জড়জগৎ পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হইলে উদ্ভিদরাজ্য পরিদৃষ্ট হয়। জড় ও উদ্ভিদের মধ্যবর্ত্তী আর কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা হইলেই বুঝা যায়—উদ্ভিদ সৃষ্টির মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ। সৃষ্টিতে জড়ের পর উদ্ভিদের প্রকাশ—ইহাই প্রামাণিক।

এই উদ্ভিদ জড়ময়। ইহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সব জড়ময়। জড়ের দ্বারা ইহা যেমন প্রকাশিত, সেইরূপ তদ্দ্বারা ইহা রক্ষিত, সেবিত, পোষিত ও স্থিত। জড় ব্যতীত ইহার বিকাশের সম্ভাবনা ছিল না। জড়ের লক্ষণের সহিত ইহার সমস্ত ভাব একরূপ, কেবল তদপেক্ষা ইহার জীবন্ত ভাব পরিস্ফুট ও উন্নত। ইহার প্রকাশে জড় কেবল উপাদান স্বরূপ, অর্থাৎ জড় ক্রমোন্নত হইয়া উদ্ভিদে পরিণত হইয়াছে কি না—ইহা প্রকৃতি তত্ত্বের কূট প্রশ্ন। এ পর্য্যন্ত কোন স্বভাববেত্তা ইহা মীমাংসা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তবে স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, জড়ের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহারা পরস্পরের সম্বন্ধ ও [illegible] বিরহিত নহে। সৃষ্টিমধ্যে এমন পদার্থ দৃষ্ট-

গোচর হয়, যাহার প্রকৃতি কতক পরিমাণে জড়ের ন্যায়, আর কতক পরিমাণে উদ্ভিদের ন্যায়। এইরূপ পদার্থ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় না, দুই একটী পদার্থ পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। সে জন্য সেইরূপ পদার্থকে সৃষ্টির দ্বিতীয় পদার্থ উল্লেখ না করিয়া উদ্ভিদকে দ্বিতীয় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

উদ্ভিদরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৃষ্টির দিকে আরও অগ্রবর্ত্তী হইলে—আমাদিগের দৃষ্টি আর একটী পদার্থের উপর পতিত হয়, ইহাই জীব-রাজ্য। উদ্ভিদ রাজ্য প্রকাশের পর ইহার প্রকাশ, প্রকৃতিতত্ত্বে নিরূপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন জড় ও উদ্ভিদের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ দেখা হইয়াছে, সেইরূপ উদ্ভিদ রাজ্য ও জীব রাজ্যের মধ্যে এক শ্রেণীর পদার্থ লক্ষিত হয়। ইহা উক্ত রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ। ইহাদিগের প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে উদ্ভিদের ন্যায় ও কিয়ৎপরিমাণে জীবের ন্যায়। তবে সৃষ্টি মধ্যে ইহাদিগের অবাহুল্য হেতু ইহাদিগকে স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভাগ করা হয় নাই।

অদ্য এই জগৎ অর্থাৎ জীব-রাজ্য আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। পূর্ব্বে আমরা সৃষ্টি-মধ্যে যে দুইটি পদার্থ অবলোকন করিয়াছি, তন্মধ্যে কোনটিও পূর্ণভাবে প্রাণশক্তি-সম্পন্ন নহে, কোনটিও জীবন্ত ভাবপূর্ণ নহে এবং দুইটিই চৈতন্যহীন। তবে উদ্ভিদে চেতনতার কিছু আভাস মাত্র আছে, কিন্তু সে আভাস জন্য ইহাকে চেতন পদার্থ বলা যাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে আমরা এরূপ রাজ্যে উপনীত হইয়াছি, যথায় চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ ও জীবন্তভাবে পূর্ণভাব লক্ষিত, যথায় গতিযুক্ততা, চলচ্ছক্তি-সম্পন্নতা ও চঞ্চলতা পরিদৃষ্ট ও ইচ্ছা-শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা কণ্ঠ শব্দ, রব, নাদ, ধ্বনি ও কাকলী পরিপূর্ণ। এখানে উৎসাহ ও উদ্যম লক্ষিত, এ রাজ্যে ক্রীড়া-কৌতুক বিরাজিত ও ইহা কোলাহলপূর্ণ। এখানে আমোদ-আহ্লাদ, বাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-দ্বেষ পরিদৃষ্ট। এখানে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ ও আত্মরক্ষা বিরাজিত। এখানে অভিলাষ, ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বর্ত্তমান। এই রাজ্য উদ্ভিদ-রাজ্যের পর প্রকাশিত হইয়াছে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা স্বতন্ত্র রাজ্য হইলেও উদ্ভিদের সহিত ইহা সম্পর্কশূন্য নহে; উল্লিখিত মধ্যবর্ত্তী পদার্থ দ্বারা ইহারা পরস্পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

জীব-রাজ্যে জীব একবিধ নহে—নানাবিধ। নানা জাতি ও শ্রেণীতে বিভক্ত। জীবের জাতি ও শ্রেণী অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবং তাহারা এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন পরিদৃষ্ট হয় না। প্রধানতঃ ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত—অণ্ডজ ও স্তন্যপায়ী। এই অণ্ডজ ও স্তন্যপায়ী জীব স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আবার এই তিন শ্রেণীর জীবসঙ্ঘের মধ্যে কতক জলচর, কতক উভচর, কতক খেচর ও কতক স্থলচর। পৃথিবীর জল, স্থল ও আকাশ জীবে পূর্ণ। যেদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই জীব দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা প্রাণময়। ইহাদিগের মধ্যে জীবনীশক্তি পূর্ণভাবে বিকশিত। এবং প্রাণ-শক্তি পরিস্ফুট, উন্নত ও পূর্ণ। এই জগতেও চৈতন্য প্রধান লক্ষণ।

এক্ষণে দেখা যাক্ পৃথিবীতে এই সকল জীব একবারে, না ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বভাব-তত্ত্ববিৎ বুধগণ স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে একবারে ইহাদিগের প্রকাশ হয় নাই। পৃথিবী যখন যেরূপ অবস্থাপন্ন অর্থাৎ তাহা যখন যে প্রকার জীবের বাসোপযোগী হইয়াছিল, তখন ইহাতে সেইরূপ জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে সৃষ্টির পর পৃথিবী যুগান্তর ধরিয়া জীববাসের উপযোগিনী ছিল না অর্থাৎ ইহা বহুকাল জীব-শূন্য ছিল। তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া ইহা জীববাসের উপযোগিতা লাভ করিয়াছিল। প্রথমে ইহা বাষ্পময়ী,পরে জলময়ী হয়। তাহার পর বহুকাল পরে ইহা স্থলময়ী হইয়াছিল। পৃথিবী যতকাল বাষ্পময়ী ছিল, ততকাল ইহা কোন জীববাসের উপযোগী ছিল না। ইহা জলময়ী হইয়া যুগযুগান্তর পরে জীববাসের উপযুক্ততা লাভ করতঃ স্থলময়ী হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করেন, যে পৃথিবীতে মৎস্যের প্রথম সৃষ্টি।

অস্মদ্দেশীয় পুরাণে যে অবতারবাদের বিষয় লিখিত আছে, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবীতে প্রথম মৎস্যাবতার, দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্ম, তৃতীয় অবতার বরাহ, চতুর্থ অবতার নৃসিংহ—এইরূপ দশ অবতারের কথা আছে। এক্ষণে পৃথিবী সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সব তত্ত্বের সহিত অবতারবাদের বিষয় বিশেষ ঐক্য দেখা যায়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন,—পৃথিবীতে মৎস্যের প্রথম সৃষ্টি, আমাদিগের অবতারবাদে মৎস্যই প্রথম অবতার। ভূতত্ত্ব-বিবরণ পাঠে জানা যায় কূর্ম্মের ন্যায় জীব অর্থাৎ যে সকল জীব জলে ও স্থলে বাস করিতে সক্ষম, মৎস্যের পর সেই প্রকার জীবের আবির্ভাব হয়। এইজন্য আমাদিগের দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্ম। উক্ত বিবরণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, সিক্ত জলা-ভূমিতে যে সকল জীব বাস করিতে সক্ষম, কূর্ম্মের পর পৃথিবীতে সেইরূপ জীবের উৎপত্তি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে উপরোক্ত প্রকারের ভূমি বরাহের বাসোপযোগী। তাই কূর্ম্মের পর বরাহের ন্যায় জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই আমাদিগের তৃতীয় অবতার। উপরোক্ত বিবরণগুলির ঐক্য অবলোকন করিয়া মৎস্য প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তের প্রতি সংশয়ারূঢ় হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। পরিশেষে স্থলের প্রকাশ হয়। এই স্থল যে বহুকাল উৎকৃষ্ট জীব-জন্তুর আবাসযোগ্য হয় নাই—তাহা সৃষ্টি-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে।

এক্ষণে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে—সৃষ্টিমধ্যে একবারে সকল জীবের প্রকাশ হয় নাই। ক্রমে ক্রমে পরে পরে ভূমণ্ডলে তাহাদিগের প্রকাশ হইয়াছে। স্বভাব-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে,ভূমণ্ডলে এক্ষণে যে উৎকৃষ্ট জীব-বংশ দৃষ্ট হয়, ইহারা নিকৃষ্ট জীবের ক্রমোন্নতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। কোন জীবের একবারে প্রকাশ হয় নাই। ক্রমোন্নতিই জীবের প্রকাশের নিয়ম। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন পৃথিবী বহুকাল জীববাসোপযোগিনী

ছিল না এবং তথায় কোন প্রাণী বা জীব ছিল না, তখন জীব প্রকাশে কিরূপে এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে? কোন সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে কোন জীবের প্রথম উৎপত্তি সাধিত না হইলে উপরোক্ত নিয়ম ইহাতে খাটে না। যখন জীব নাই, তখন তাহার ক্রমোন্নতি হইবে কিসে? এ সিদ্ধান্ত তত যুক্তি-মূলক নহে। কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মে জীবের উৎপত্তি সাধিত হইয়াছিল, পরে সেই জীবের ক্রমোন্নতির দ্বারা অপর উৎকৃষ্ট জীব প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা যুক্তিমূলক বাক্য। পঙ্ক বা কর্দ্দমের উপর বায়ু ও সূর্য্যাতপের কার্য্য দ্বারা শম্বুক জাতীয় জীব সকলের উৎপত্তি সাধিত হয়, ইহা প্রাণী-তত্বে প্রকাশ। ধান্য ছেদনের পর ধান্যক্ষেত্রে যাহারা পরিভ্রমণ ও তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহারা উক্ত ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে শম্বুক জাতীয় জীব দৃষ্টিগোচর করেন। কি উপায়ে সেই সকল শম্বুক তথায় নীত হইয়াছিল, অনুসন্ধানে ইহার কারণ কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় না। উপরোক্ত কারণে তথায় যে উহাদের উৎপত্তি সাধিত হয়, ইহাই বোধ হয়। পঙ্কিল জলে শৈবালের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। সেই জলাশয়ের জল যে সময় নির্ম্মল ছিল, তখন তথায় শৈবাল দৃষ্টি হইত না। সেই জল পঙ্কিল হইতে আরম্ভ হইলে তথায় শৈবাল দৃষ্ট হইল। কেহ শৈবাল আনয়ন পূর্ব্বক তথায় ফেলিয়া দেয় নাই, ইহা বেশ বুঝা যায়। পঙ্কিল জলে এবং সূর্য্যের উত্তাপে তথায় ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা যুক্তিমূলক বাক্য। শৈবাল জলজ পদার্থ। ইহাতে জড় বা উদ্ভিদের ভাব দেখা যায়। শৈবালের ন্যায় কর্দ্দমপূর্ণ ময়দান বা পঙ্কময় জলাশয়ে শম্বুকের উৎপত্তিও অসম্ভব নহে। ক্রমশঃ—

শ্রীকানাইলাল নাগ।

নব অভ্যুত্থান।

বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি কেন গেছ চলি,'
কেন কাছে নাই;
জীবনে জড়ায়ে ছিলে ভোগের শিকলি,
খুলে গেছ তাই!
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে ছিলে শুধু উপভোগ
তৃষার সঞ্চার,
সে তৃষা আকুল করে;—তাই প্রেম-যোগে
ছাড়িলে সংসার!
এতদিনে বুঝাইলে দেহ বিসর্জ্জিয়া—
দেহ কিছু নয়;
দেহের অতীত প্রেম আজি আস্বাদিয়া
কি অনন্দোদয়!

* * * *

আর না নিন্দিব তোমা হে মৃত্যু মহান্,
তুমি বন্ধু মোর;
তোমার পরশে তার "নব অভ্যুথান"
টুটে মায়া-ডোর!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

বেহুলা।

(পৌরাণিক ক্ষুদ্র গল্প)

(১)

পতির গলিত শব বুকে আবরিয়া,
চলিলা বেহুলা সতী ভেলা আরোহিয়া।

চাঁদ-সদাগরের প্রকৃত নাম চন্দ্রধর বণিক্য। তিনি প্রসিদ্ধ চম্পক-নগরের অধিপতি। চন্দ্রধর জাতিতে বেণে—ব্যবসায় বাণিজ্য; তাই জন-সমাজে তিনি চাঁদ-সদাগর বলিয়া বিখ্যাত। চাঁদ ধর্ম্মবীর—উদার প্রাণ; ত্রিলোক পূজ্য মহেশ্বর তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা—তিনি শৈব।

শিবভক্ত চন্দ্রধর স্বীয় ইষ্ট-দেবতা ব্যতীত অন্য দেবতা মানিতেন না—পূজিতেন না। এদিকে শিবের কঠোর আদেশে বা অলঙ্ঘ্য অভিশাপে চাঁদ না পূজিলে মর্ত্ত্যে শিব-সুতা মনসা দেবীর পূজা প্রচার হয় না। দেবীর পূজা পাওয়া আবশ্যক। চাঁদ তাঁহার পূজা না করায় তিনি চাঁদের প্রতি যারপর নাই রুষ্ট। দেবী সুযোগ পাইলেই তাঁহার ক্ষতি করেন; কিন্তু চন্দ্রধরকে প্রাণে মারা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে যে মর্ত্ত্যে তাঁহার পূজা প্রচারের বাধা হয়। তাঁহার ইচ্ছা, চাঁদ অন্য দেবতা মানুক—তাঁহার পূজাও করুক। চন্দ্রধরের পূজা না পাইলে দেবীর প্রাণে শান্তি নাই।

বিষহরী দেবীর দারুণ রোষে ক্রমে চন্দ্রধরের ছয়টি পুত্র অকালে কালের গ্রাসে চলিয়া পড়িল। ছয়টি বিধবা পুত্রবধূর উষ্ণ নিশ্বাসে এবং বণিক-পত্নী সনকাসুন্দরীর কুররী-ধ্বনিবৎ বিলাপ নিনাদে চাঁদের সুখের সংসারে দারুণ দুঃখের অনল জ্বলিয়া উঠিল। একে একে চাঁদের সকল পুত্রগুলি কাল-কবলে কবলিত। এখন বাকী কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ লক্ষীন্দর। আশার এই শেষ সলিতাটি নিবিলেই তাঁহার সব ফুরাইয়া যায়। দুঃখিনীর ধনের ন্যায় স্নেহময়ী জননী সনকা অতি যত্নে,সদা সাবধানে পক্ষিণীর ন্যায় বুকে আবরিয়া এ রত্ন রক্ষা করিতেছেন।

একদা এক বিজ্ঞ দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলি-লেন,—"মনসাদেবীর ভীষণ ক্রোধে বিবাহরাত্রে সর্পাঘাতে লক্ষীন্দরের মৃত্যু হইবে।" এ নিদারুণ কথাটা জননী সনকার অজ্ঞাত থাকিল। চাঁদ ব্যতীত এ নিষ্ঠুর অভিশাপ বার্ত্তা আর কেহ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তথাপি পাষাণ-কঠোর প্রাণ চাঁদ অচল—অটল। শিবভক্ত চাঁদ কিছুতেই শিব-সুতা মনসাদেবীর অর্চ্চনা করি-লেন না। চাঁদের ঘোর উপেক্ষায় ক্রমে দেবীর দুর্জ্জয় ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িতে লাগিল।

চাঁদের চাঁদপানা ছেলে লক্ষীন্দর কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলেন। নবযৌবন সমাগমে তাঁহার সোণার অঙ্গে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-রাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। লখাইর অনিন্দ্য-সুন্দর নবীন-নধর দিব্য-কান্তি বরবপু দেবকুমা-রের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নবীন যুবক লক্ষীন্দর পৈত্রিক ব্যবসায় নৈপুণ্যে এবং জ্ঞানে-গুণে ও আপনার অসাধারণ চরিত্রপ্রভাবে বিশাল চম্পক নগরীর গৌরবস্থল হইয়া আপামর সাধারণের যারপরনাই প্রীতিভাজন, আপনার জন হইয়া উঠিলেন। চাঁদের শোক-দুঃখ পূর্ণ আঁধার গৃহ অভিনব আলোকে—নবীন [illegible] নব আশায় আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এমন পরম সুন্দর সর্ব্বগুণাধার পুত্র-রত্নের প্রতিও পাষাণ-কঠোর প্রাণ পিতা স্নেহ প্রদর্শন করেন না—আদর যত্ন দেখান না, এমন কি একটিবার পুত্রের চাঁদবদনের দিকে একটুকু দৃষ্টি করিতেও যেন তিনি কাতর। প্রাণাধিক পুত্র নিকটে আসিলে স্নেহময় জনক কি জানি কেন, অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লন- মুখ অবনত করেন! এজন্য অপত্যবৎসলা স্নেহময়ী জননী সনকা বড় দুঃখিতা—পুত্রের প্রতি পতির ব্যবহারে যারপরনাই মর্ম্মাহতা। সনকা মনে করিতেন, পুত্রশোকে সদাগর উদ্‌ভ্রান্ত; তাই একমাত্র স্নেহের নখার প্রতি তিনি এত নির্ম্মম।

জননী সনকা জানিতেন না যে, তাঁহার এ অমূল্য রত্ন স্বামীর কর্ম্ম দোষে—দেবীর দুর্জ্জয় রোষে শীঘ্রই মৃত্যুর করাল-গ্রাসে ঢলিয়া পড়িবে; তাই পতি একমাত্র স্নেহভাজন পুত্রের প্রতি এমন নিষ্ঠুর—এত উদাসীন। পুত্রের এ অনুপম রূপ-যৌবনশ্রী দর্শনে স্নেহময় পিতা সদাই মনে ভাবিতেন যে, হায়! এমন অনন্ত রূপ-রাশি—এমন গুণগরিমা পূর্ণ মূর্ত্তিমান প্রতিভা—এমন সোণার প্রতিমা তিনি কেমন করিয়া মৃত্যুর করাল-গ্রাসে ডালি দিবেন।

প্রাণপ্রতিম পুত্রের প্রতি স্বামীর এ উপেক্ষা-অনাদর পুত্রশোক কাতরা স্নেহময়ী জননীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ছয় পুত্রের মৃত্যু জনিত গভীর শোক অন্তরের অন্তস্থলে স্ববলে চাপিয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণাধিক লখাইর বিবাহের জন্য উতলা হইলেন। প্রাণের এ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আগুন, যখন বড় বেশী প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন অশ্রুমুখী জননী পুত্রের বিবাহের জন্য স্বামীর নিকট প্রথমে অনুরোধ উপরোধ, পরে যারপরনাই আন্তরিক দুঃখ জানাইয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন।

পত্নীর কাতর প্রার্থনায় দৈবজ্ঞের সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ বাণী—বাসর ঘরের সেই ভয়াবহ স্মৃতি সদাগরের মনে জাগিয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্র লক্ষ্মীন্দরের অমঙ্গল আশঙ্কায় পিতার পাষাণ-কঠিন প্রাণ কি এক অজ্ঞাত বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় পতিব্রতা পত্নীর সুসঙ্গত প্রস্তাবে—তাঁহার কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। স্বামীর উপেক্ষায় স্ত্রীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

উপেক্ষিতা সনকা স্বামীর নৈরাশ্য পূর্ণ উত্তরে প্রাণের অসহ্য জ্বালায় নিয়ত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরলোকগত ছয় পুত্রের গভীর শোক আবার নূতন হইয়া যুগপৎ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। প্রৌঢ়ার আরক্তিম গণ্ডদ্বয় অশ্রু প্রবাহে সিক্ত হইল—অতি ক্রন্দনে পদ্ম আঁখি-যুগল জবাকুসুমনিভ রক্তিম রাগ ধারণ করিল, কুররীকণ্ঠে উচ্চ বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার কোকিল কণ্ঠ অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া উঠিল। স্বর্ণ-প্রতিমা সনকা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পুত্র-শোককাতরা রোরুদ্যমানা অশ্রুমুখী সনকার সে বিষম শোক-বিহ্বলতা দর্শনে চাঁদ-সদাগরের বজ্রময় কঠিন হৃদয় দ্রব হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দৈবজ্ঞের গণনা যে প্রকৃতই সত্য হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? জ্যোতিষের অনেক কথা মিথ্যা হইতেও দেখা যায়। যাহা হউক, স্ত্রী-হৃদয় বড় দুর্ব্বল;

পুত্র-বিয়োগ বিধুরা স্নেহময়ী সনকা এ নিদারুণ গণনার কথা শুনিলে মর্ম্মাহত হইবেন—তাঁহার কুসুম-পেলব হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অতএব ভীষণ অভিশাপের ন্যায় দৈবজ্ঞের গণনার এ অপ্রীতিকর নিষ্ঠুর কাহিনী সনকার নিকট অপ্রকাশ থাকাই ভাল। তবে দৈবজ্ঞের কথাটা একেবারে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। যাহাতে দেবী বিষহরী প্রতিকূল হইয়াও আমার লক্ষ্মীন্দরের কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারেন, বিবাহের "বাসর ঘর" সেইরূপ ভাবেই নির্ম্মাণ করিতে হইবে। গৃহ-নির্ম্মাণ কৌশলে বা বিষ-ধর ভীতিপ্রদ তীব্রতর অমোঘ ঔষধি প্রভাবে মনসার চেষ্টা ব্যর্থ করিতেই হইবে। এইরূপে চাঁদ দেবীর সহিত ঝগড়া করিয়া "খোদার উপর কারিগড়ি" জুড়িয়া দিলেন। বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধানের খণ্ডন করা মানবের পক্ষে যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, সদাগর তাহা বিস্মৃত হইলেন।

সদাগর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মীন্দরের জন্য রূপ-গুণ-শালিনী বধূর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে ঘটক প্রেরিত হইল। অশ্রুমুখী সনকার শুষ্ক অধর-প্রান্তে আবার মধুর হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সায়-সদাগরের বাড়ী নিছনি গ্রামে। তিনি সে গ্রামের অধিপতি—একজন ক্ষুদ্র ভূপতি। তাঁহার স্ত্রীর নাম অমলা। অমলা সতী-লক্ষ্মী-পুণ্যবতী। সদাগরের তিন পুত্র—হরিহর, ভুবন ও শ্রীরাম। বিপুলা এই পুণ্যময় জীবন পিতা ও পুণ্য পবিত্রতাময়ী জননীর একমাত্র প্রাণাধিকা স্নেহের দুহিতা। স্নেহময়ী জননী কন্যাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—বেহুলা।

বেহুলা রূপসী ও বিদুষী এবং চরিত্রপ্রভাবে সর্ব্বত্র গরীয়সী। বেহুলা কিশোরী-যুবতী হইলেও এখনও অবিবাহিতা। সঙ্গীতে-সাহিত্যে, রন্ধনে-গার্হস্থ্যে এবং নৃত্যে ও চিত্র-কলায় তাঁহার সম অধিকার। বেহুলা কখনও যোগিনীর ন্যায় যোগ-নিরতা, আবার কখনও বা বয়ঃসুলভ কেলি-কৌতুকে আসক্তা। দেব-দ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি। পরের দুঃখে তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া সমবেদনার পবিত্র অশ্রু নিয়ত গড়াইয়া পড়িত। বিধবার উষ্ণ নিশ্বাসে তাঁহার কোমল প্রাণ শিহরিয়া উঠিত!—কি এক অজ্ঞাত অননুভবনীয় দুঃখ-যাতনায় বেহুলার হৃদয় ফাটিয়া যাইত। পতির সহিত সতীর সহমরণ যাত্রা—জ্বলন্ত চিতারোহণ দৃশ্য দর্শনে তাঁহার মানস-পটে কি এক স্বর্গীয় ভাব-ময় অপূর্ব্ব চিত্র প্রতিফলিত হইত। পতিনিন্দা শ্রবণে সতীর আত্ম-বিসর্জ্জন, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ও অলৌকিক পতিভক্তি, সাবিত্রীর মৃত পতির দেহে পুনঃ জীব-সঞ্চার এবং পতির ঋণ পরিশোধার্থে সতী শৈব্যার আত্ম-বিক্রয় প্রভৃতি পবিত্র কাহিনী পাঠ করিতে করিতে অশ্রু-প্রবাহে তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইত।

বেহুলা—মধুরহাসিনী ও প্রিয়ভাষিণী। তাহার অমিয়মধুর সরল উপদেশে কত কলহ-প্রিয় পরিবারে শান্তি ও প্রীতির অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইত—কত দুঃখের সংসারে সুখের মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিত, কত দুঃখ-দগ্ধ মরুময় বিশুষ্ক প্রাণে বিমল সুখের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইত।

বেহুলা পরম ভক্তিমতী কিশোরী যুবতী। বার মাসে বার ব্রতানুষ্ঠান এবং দেব-দেবীর আরাধনা ও দেবতার পবিত্র চরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য-কর্ম্ম ছিল। তিনি প্রত্যহ মনসাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া আন্তরিক প্রীতি অনুভব করিতেন। ফলতঃ জ্ঞানে-গুণে এবং খেলা-ধূলা ও ভক্তিতে বেহুলা আদর্শ রমণী ছিলেন।

গৃহে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অরক্ষণীয়া কন্যা; কন্যার বিবাহ যোগ্য বয়স উত্তীর্ণ দেখিয়া, স্নেহপ্রবণ জনক-জননী বেহুলার বিবাহের জন্য বড় চিন্তিত হইলেন। বহু অনুসন্ধানেও বেহুলার উপযুক্ত বর জুটিল না। এই সংবাদ ঘটকমুখে চন্দ্রধর শুনিতে পাইয়া তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে কন্যা দেখিতে সায়-বেণের ভবনে উপনীত হইলেন। এবং ভাবী পুত্রবধূকে পরীক্ষার্থ ছলনাপূর্ব্বক লৌহনির্ম্মিত কলাই রন্ধন করিতে দিলেন। এ অসম্ভব ঘটনা দর্শনে সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু ভক্তিমতী বেহুলার প্রতি তাঁহার নিত্যা-রাধ্যা দেবীর বড় কৃপা ছিল; দৈবশক্তি প্রভাবে মুহূর্ত্তে সে লৌহকলাই সুসিদ্ধ হইয়া গেল! দৈববল, ভক্তি-বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তির অনন্ত প্রভাব। এ অলৌকিক রন্ধন ব্যাপার দর্শনে সকলে মহাবিস্মিত হইল—অনেকে মনে মনে চিন্তা করিল—বেহুলা মানবী নহেন, শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী। চন্দ্রধর ভাবী বৈবাহিকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কন্যা দেখি-লেন এবং সম্বন্ধ স্থির করিলেন। চন্দ্রধর—বেহুলার ন্যায় রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী তুল্য সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পুত্রবধূ পাইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-বদনে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

লক্ষ্মীন্দর-বিপুলার বিবাহ। বিপুল বৈভব-শালী চন্দ্রধর পুত্রের বিবাহে মহা আড়ম্বরের অনুষ্ঠান করিলেন। চম্পক নগরের অদূরে সাঁতালী পর্ব্বতে লৌহময় বিরাট বাসর-গৃহ নির্ম্মিত হইল। সেই সুদৃঢ় সুবিশাল—

"মঞ্জিসের বাহিরেতে পাইক প্রহরী।
পোষানীয়া নকুল ময়ূর সারি সারি ॥
তার পাশে সারি সারি ঔষধ লাগায়।
দূর হইতে নাগগণ গন্ধেতে পলায় ॥
তাহার বাহিরে যত হস্তী ঘোড়া ঠাট।
তাহার বাহিরে সব দিলেক কপাট ॥
তাহার বাহিরে কৈল অগ্নি যে প্রচুর।
নিরবধি জ্বলিতেছে প্রকাশ নহে দূর ॥
এইরূপে নানা যত্ন করি চন্দ্রধরে।
হাতে গদা লইয়া আপনি ফিরে দূরে ॥"

বিবাহ—নিছনি নগরে সায় সদাগরের ঘরে। মহা ঐশ্বর্য্যশালী সায় বেণের গৃহ বিবাহের মহা আড়ম্বরে ও আনন্দ উৎসবে ভর-পূর; আনন্দ-কোলাহলে সে বিরাট পুরী সদা মুখরিত। বিচিত্র স্বর্ণছত্র তলে বিবাহ হইতে-ছিল; মন্ত্রপাঠকালে সেই সুন্দর সুবর্ণছত্রকে বিশাল ভুজঙ্গ-ফণা ভ্রমে সহসা লক্ষ্মীন্দর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এ অভাবনীয় অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে সকলের মনে নবদম্পতির ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কার ছায়াপাত হইল। ধর্ম্মবীর চন্দ্রধর, বেহুলার পিতা সায়-সদাগর এবং মাতা অমলা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনগণ শঙ্কিত মনে দেব-তার চরণে লক্ষ্মীন্দর-বেহুলার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে হর্ষ-বিষাদে

বিবাহের শুভ মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হইল।

অনন্তর চাঁদ নব বৈবাহিককে নির্জ্জনে সকল কথা বুঝাইয়া পুত্র-পুত্রবধূ সহ সাঁতালি পর্ব্বত-গৃহে উপস্থিত হইলেন। নব-দম্পতী সেই গিরি বক্ষ বিরাজিত লৌহময় সুদৃঢ় বাসর-গৃহে রক্ষিত হইলেন। স্বয়ং চন্দ্রধর হিন্তালের ভীম যষ্ঠি হস্তে দ্বিতীয় ভৈরবের ন্যায় সে গৃহের প্রহরী-গণের তত্ত্বাবধান কার্য্যে বিনিদ্র-নেত্রে নিশা-যাপন করিতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে চাঁদের ভীম হুঙ্কারে দিক্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সেই লৌহ-বাসরে প্রবেশকালে সহসা নব-বধূর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, অসাবধান হস্তসঞ্চা-লনে তাঁহার সিঁথির সিন্দুর বিন্দু মুছিয়া গেল। অমঙ্গল আশঙ্কায় বেহুলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, —অনিচ্ছায় নয়নপ্রান্তে একবিন্দু উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বেহুলা গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণ-কৌটা খুলিয়া আবার সিন্দুর পরিলেন।

লক্ষীন্দর নিদ্রিত। দৈবজ্ঞের গণনার কথা বেহুলার অশ্রুত ছিল না। তাই সতী নিদ্রিত পতির পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। পতিকণ্ঠস্থ অযত্ন-বিক্ষিপ্ত কুসুম মাল্যটি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে যাইয়া বেহুলা আপনার মৃদুসঞ্চালিত কুসুমপেলব করা-স্পর্শে অনিচ্ছায় লক্ষীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। লক্ষীন্দর নবপরিণিতা বণিতাকে বাহু-বন্ধনে বুকে আবরিয়া লইতে সাদরে হস্ত-প্রসারণ করিলেন। সদ্য-পরিণিতা লজ্জাবতী সতী ব্রীড়াবনত বদনে একটুকু দূরে সরিয়া বসিলেন। লক্ষীন্দর পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সাদ অপূর্ণ রহিল—অঙ্কলক্ষ্মীকে আর বক্ষে ধারণ করা হইল না! মানুষের সকল সাধ পূর্ণ হয় না।

লক্ষীন্দর পুনশ্চ জাগিলেন। দেখিলেন তখনও বেহুলা বিনিদ্র নয়নে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। পতি, পত্নীর নিকট চারিটি ভাত চাহিলেন; তাঁহার বড় ক্ষুধা। কিন্তু এবারও মুখের কথাটি না কুড়াইতে—বেহুলা উত্তর দিতে না দিতে তিনি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বেহুলা প্রথমে স্বামীকে ফলাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সংকল্প করিলেন। তার-পর একটুকু চিন্তা করিয়া বরণ-ডালার উপকরণ গুলি লইয়া অতি ক্লেশে স্বামীর জন্য চারিটি অন্ন প্রস্তুত করিলেন। তিনি স্বামীকে আহার করিবার জন্য কত ডাকিলেন, কিন্তু লক্ষীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিল না। বেহুলা অন্নভাণ্ড সম্মুখে করিয়া বসিয়া রহিলেন; আশা - ঘুম ভাঙ্গিলে স্বামী সে অন্ন আহার করাইবেন।

তখনও বেহুলা স্বামী-শয্যায় তেমনিভাবে বসিয়াই আছেন। সহসা সেই লৌহ বাসরের ঈশাণকোণে সিন্দুরবিন্দু চিহ্নিত স্থানে একটা রন্ধ্রপথ প্রকাশ পাইল। দেবী-ভয়ে ভীত বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মকার গৃহ নির্ম্মাণ কালে সূক্ষ্ম অঙ্গার চূর্ণ পূরিয়া এ রন্ধ্রপথ রাখিয়াছিল। এখন দেবীর ইচ্ছায় ভীষণ বিষধর সর্পের বিষম বিষময় উষ্ণ নিশ্বাসে ছিদ্রপথের সেই অঙ্গার-কণাগুলি টুটিয়া যাইয়া এক পরিষ্কার রন্ধ্রপথে পরিণত হইল। সেই অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে এক ক্ষুদ্রকার বিষধর সর্প গৃহে প্রবেশ করিল।

বেহুলা কৌশলপূর্ব্বক সে ভুজঙ্গকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর রাত্রে আরও দুইটি কালসর্প সেইরূপ ভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়াই বন্দী হইল।

বেহুলা পতি পদতলে বসিয়া বসিয়া সেই রন্ধ্রপথের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। শ্রম, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ও উপবাসক্লিষ্টা ক্ষীণাঙ্গিনী বেহুলা আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন? কালনিদ্রা তাঁহাকে বড় জ্বালাতন করিতে লাগিল। অনিচ্ছায় অজ্ঞাতভাবে ক্ষণকালের জন্য বেহুলা বিষম ঘুমঘোরে শুইয়া পড়িলেন। এমত সময়ে এক অতি ভীষণ কালনাগিনী সেই রন্ধ্রপথে বাসরগৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভুজঙ্গিনী আপনার ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সেই কালসাপিনী নিদ্রিত লক্ষ্মীন্দরের পদ-সন্নিহিত হইল; নিয়তির দুলঙ্ঘ্য বিধানে সহসা নিদ্রাঘোরে লক্ষ্মীন্দরের পদ সর্পিনীর দেহ স্পর্শ করিল। আঘাত পাইয়া ভীষণ বিষধর সদর্পে মস্তক উন্নত করিয়া সজোরে তাঁহাকে দংশন করিল। সর্পাঘাতে লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

স্বামীর চীৎকারে বেহুলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ত্রস্তে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, কালনাগিনী অতি দ্রুতগতিতে রন্ধ্রপথে পলায়ন করিতেছে। বেহুলা ক্ষিপ্রহস্তে কাটারির আঘাতে নাগিনীর গৃহাভ্যন্তরস্থ সুদীর্ঘ পুচ্ছ কাটিয়া ফেলিলেন। পুচ্ছহীন কালনাগিনী দ্রুতগতিতে পলায়ন করিল। সহসা প্রভাতী বায়স-কণ্ঠ-ধ্বনির সহিত সে কাল নিশার অবসান হইল।

নববধুর অপরিস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে চাঁদ সদাগর ও সনকা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ ত্রস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বার মুক্ত ছিল। বেহুলা কালনাগিনীর অনুসরণ জন্য দ্বার খুলিয়া ছিলেন; আর সে মুক্তদ্বার বন্ধ করেন নাই।

গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলে দেখিলেন, নববধু বেহুলা স্বামী-শব ক্রোড়ে করিয়া দেবী-প্রতিমার ন্যায় বসিয়া আছেন। গুরুজনেরা গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার সেই অস্ফুট রোদন থামিল। স্নেহময়ী জননী তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র লক্ষ্মীন্দরের 'সোণার বরণ' বিবর্ণ দেখিয়া বাতাহতা স্বর্ণলতিকার ন্যায় ভূতলে অবলুণ্ঠিতা হইলেন। আত্মীয় স্বজনের বিলাপধ্বনিতে বিবাহ-বাসর শোক-দুঃখপূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইল।

বেহুলা নির্ব্বাক—নিস্পন্দ; বুঝি বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা। শ্বশ্রূর ক্রন্দন, আত্মীয়-স্বজনের রোদন-কোলাহল কিছুই তাঁহার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। তিনি তন্ময়হৃদয়ে ভাবিতেছেন, হায়! কেন স্বামীর প্রথম প্রীতিসম্ভাষণে সরমে দূরে সরিয়া গিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত দিলাম? তাঁহার বাসনা অতৃপ্ত রহিল; হায়! তাঁহার প্রার্থনাসত্বেও ক্ষুধার অন্ন আর সে মুখে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। শোকে-দুঃখে বেহুলার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল,—দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুপাত হইতে উদ্যত হইল, তিনি চক্ষের সে জলধারা পড়িতে দিলেন না; সযত্নে উষ্ণ অশ্রু নিরোধ করিলেন। একবার চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, শাশুড়ীর অপ্সরাবিনিন্দিত সুন্দর দেহলতা অযত্নে ভূতলে বিক্ষিপ্ত আছে।

শ্বশ্রূর অবস্থা দর্শনে তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। হায়! অদৃষ্টবশে কর্ম্মদোষে এমন সোণার শ্বাশুড়িকে লইয়া তিনি শাঁখা-সিন্দুর ধারণ করিয়া একদিনের জন্যও পতির সংসার করিতে পারিলেন না।

সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে লক্ষীন্দরের চিতা প্রস্তুত হইল। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বে লখাইর শব-দেহ—দেবদুর্লভ সোণার অঙ্গ শ্মশানের অনলে ভস্মীভূত হইবে—বেহুলার সব ফুরাইবে। তিনি শ্মশানে স্বামী-শবের পার্শ্বে যাইয়া কর-যোড়ে দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রাণে বড় সাধ, স্বামীসহ এক চিতায় পুড়িয়া সহমৃতা হইবেন; অথবা সর্পদষ্ট লক্ষীন্দরের শবদেহ অনলে দগ্ধ না করিয়া ভেলায় ভাসাইবার জন্য গুরুজন-দিগকে অনুরোধ করিবেন। তাঁহার প্রাণে আশা, হয়ত কোনও শক্তিশালী সর্পরোঝা কৃপা করিয়া স্বামীর মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতে কিংবা দৈববশে ভাসমান ভেলা দৈবদেশে উপ-নীত হইলে, দেবতার কৃপায় তাঁহার প্রাণারাধ্য ধন লক্ষীন্দর পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারেন। এইরূপ আশার প্রেরণায় নববধূ বেহুলা লজ্জার আবরণ দূরে সরাইয়া ফেলিয়া গুরুজনদিগকে তাঁহার প্রাণের কথা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন আর বেহুলার লজ্জা-ভয় নাই, শ্মশানে লজ্জা তিষ্ঠিতে পারে না।

বেহুলা স্বামী-শব সহ ভেলায় ভাসিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার এ ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলেন। তখন বেহুলা বলিলেন,—

"স্বামী সে নারীর ধন স্বামী সে পরাণ।
স্বামী বিনে জীবন মরণ সম জ্ঞান॥
আর লোকে মুক্তি পায় যোগ তপোবলে।
স্বামী সেবায় নারীর মুক্তি পদ মেলে॥"

বেহুলা এরূপ অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ করুণ কথায় সকলে বিস্মিত হইল। আত্মীয়েরা নববধুর এরূপ সকরুণ মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এক সুবৃহৎ ভেলা প্রস্তুত হইয়া গুঞ্জরি নদীর (গাঙ্গুর নদীর) জলে ভাসিল। লক্ষীন্দরের শব-দেহ সেই ভেলায় উত্তোলিত হইল। বিবাহের বেশ-ভূষায় ভূষিতা, বিচিত্র পট্টাম্বর পরিহিতা সিন্দুর-চন্দনচর্চ্চিতা সদ্য পরি-ণিতা বেহুলা স্বর্গভ্রষ্টা দেবী প্রতিমার ন্যায় সেই 'কলার মান্দাসে' চড়িয়া স্বামী-শবপার্শ্বে উপ-বিষ্ট হইলেন।

সোণার প্রতিমা বেহুলা বান্ধবশূন্য হইয়া একাকিনী লক্ষীন্দরের শব সহ ভেলায় ভাসিয়া যাইবেন, ইহা তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রাণে অসহ্য হইল। তিনি পুত্রবধূকে প্রবোধিয়া গৃহে ফিরিয়া লইবার জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় ধূলিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহুলা কিছুতেই গৃহে ফিরিতে স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি শ্বাশুড়ীকে বলিলেন,—"মা! তুমি আর কাঁদিও না; তোমার আশীর্ব্বাদে আমি আবার ফিরিব। তোমার স্নেহের ধনকে লইয়া গৃহে বাসর-গৃহের যে কক্ষে কড়ার তৈলে দীপ জ্বলিতেছে, সে কক্ষটী যেন আমার পুনরাগমন কাল পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকে; দেবতার কৃপায় আমি স্বামীসহ ফিরিয়া আসিয়া যেন সে দীপ

এমনিভাবে প্রজ্জ্বলিত দেখিতে পাই। আর বাসরঘরে স্বর্ণথালায় যে অন্ন রহিয়াছে, উহা দাড়িম্ববৃক্ষতলে পুতিয়া রাখিবেন।" কথা সম্পুর্ণ হইতে না হইতে লক্ষীন্দরের শব-দেহ ও স্বর্ণ প্রতিমা বেহুলাকে বক্ষে লইয়া কদলি-ভেলা ভাসিয়া চলিল। নদীতীরস্থ শত শত নরনারী পুণ্য-প্রতিমা বেহুলার তাৎকালিক পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় হইল বলিয়া মনে করিতে করিতে অশ্রুপ্রবাহে বুক ভাসাইয়া গৃহে প্রতি-গমন করিলেন।

(২)

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। তথাপি পুত্র-শোকাতুরা সনকা নদী-সৈকতে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ জগৎ সাঁজের আঁধারে সমাবৃত হইল। অগত্যা সনকা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনেরা পাষাণে বুক বাঁধিয়া মৃতের সহিত জীবন্ত সোণারপ্রতিমা গাঙ্গুড়ের জলে বিসর্জ্জন দিয়া অনিচ্ছায় গৃহে ফিরিলেন। কোন এক জরা-মরণ-বিচ্ছেদ শূন্য অজানা দেবদেশের অজ্ঞাত পথে বেহুলা ভাসিয়া চলিলেন। পতি-শব সহ সতীর সে প্রস্থান স্থান মহাতীর্থে পরিণত হইল। গাঙ্গুড়ের সে প্রস্থান-ঘাটের জল পতিত-পাবনী সুরধনীর পবিত্র সলিল জ্ঞানে সকলে মস্তকে স্পর্শ করিতে লাগিল। সকলে সতীলক্ষী পুণ্যবতী জ্ঞানে উদ্দেশ্যে বেহুলার প্রতি প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইল।

অশুভবার্ত্তা জলে পতিত তৈল-বিন্দুর ন্যায় অতি শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; বেহুলা লক্ষীন্দরের এই শোকাবহ অপূর্ব্ব করুণ কাহিনী—বেহুলার এই হৃদয় বিদারক পুণ্যকথা অল্পকাল মধ্যেই দূর দুরান্তরে প্রচার হইয়া পড়িল। যে শুনিল, সেই মনে করিল, বেহুলা রমণী-রত্ন—বেহুলা এযুগের সীতা-সাবিত্রী—বেহুলা স্বর্গের দেবী! কত স্থানের কত লোক নদীতীরে আসিয়া বেহুলার দর্শন লাভে দেবী দর্শনের পুণ্য সঞ্চয়ে কৃতার্থ হইল। ক্রমে কথাটা নিছনি-নগরে সায়বেণের ঘরেও পহুঁছিল। বেহুলার স্নেহময়ী জননী অমলা, জামাতা ও কন্যার শোকে উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তিনি শেলবিদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় প্রাণের জ্বালায় নিয়ত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তখন বেহুলার জ্যেষ্ঠ সহোদর ভগিনীর সংবাদ লই-বার জন্য গাঙ্গুড়ের তীরে তীরে চম্পক নগরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই ভ্রাতা, ভগিনীর দর্শন পাইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ-সমা সহোদরা অশ্রুমুখী বেহুলা, রম্ভাতরু নির্ম্মিত মান্দাসে বসিয়া আনত-বদনে অনিমিষ দৃষ্টিতে পতির মুখপানে চাহিয়া আছেন। কদলি-ভেলা জলে ভাসিতেছে, নাচিতেছে, হেলিতেছে, দুলি-তেছে; উপবাস-শীর্ণা শোক-দুঃখকাতরা পতি পাগলিনী বেহুলার সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই। তাঁহার ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুর-বিন্দু শোভা পাইতেছে; পরিধেয় বিচিত্র পট্টবাসাঞ্চল বায়ু-হিল্লোলে মনোহর পতাকার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া উড়িতেছে। নদীগর্ভস্থ জলজন্তুগণ লক্ষীন্দরের মৃত দেহ গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, বিরাটকায় কুম্ভীরগুলি বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া শবসহ সতীর ক্ষুদ্র দেহ-স্বাদ গ্রহণ

করিবার জন্য ভেলার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে, আর পতিগতপ্রাণা বেহুলার পূত হস্ত সঞ্চালিত সলিল-হিল্লোলে সে হিংস্র জন্তুকুল সভয়ে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

ভগিনীর এ শোচনীয় দশা দর্শনে শোকে দুঃখে ভ্রাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ভ্রাতা পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য ভগিনীকে অনেক অনুরোধ উপরোধ ও কাঁদা-কাটি করিলেন। কিন্তু বেহুলা কিছুতেই সহোদরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "*স্বামীর মৃতদেহে জীবন সঞ্চার না হইলে আমি* কিছুতেই গৃহে ফিরিব না।

ভ্রাতার কথার উত্তর দিতে বেহুলা শোক-ভরে বড় কাতর হইলেন—অশ্রু-প্রবাহে তাঁহার গোলাপ-রক্তিম গণ্ড প্লাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে—ভ্রাতা-ভগিনীর কথা শেষ হইতে না হইতেই তীব্র জলস্রোতে কদলিভেলা সুদূরে ভাসিয়া চলিল। তখন স্নেহময় ভ্রাতা বিষাদ-ম্লান বদনে অশ্রুমোচন করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। হায়! অপত্যবৎসলা অমলার শিরে যুগপৎ সহস্র বজ্রপাত হইল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে লক্ষ্মীন্দরের শবদেহ পচিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার দেবদুর্লভ সুন্দর শরীর পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। গলিত শবের বিষম দুর্গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। সোণার অঙ্গে ক্রিমি-কীট সমূহ কিলিবিলি করিতে লাগিল। বিষাদপ্রতিমা অশ্রুমুখী বেহুলা নিয়ত স্বহস্তে সেই পূতিগন্ধি গলিত শবমাংস হইতে ক্রিমিকীট সকল বাছিয়া বাছিয়া ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সেই নিরানন্দময়ী দেবীমূর্ত্তি বেহুলার রূপ-মাধুরী উছলিয়া পড়িতে-ছিল। তখনও তাঁহার অনিন্দ্য সুন্দর রূপরাশি দর্শনে দর্শকের প্রাণে পুনঃ পুনঃ সে অনুপম রূপ-সুধাপানের দারুণ পিপাসা জাগিয়া উঠিত, পথের লোক আপন কর্ম্ম ভুলিয়া মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিত।

"পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগৎ-মোহিনী কেন মরা লৈয়া কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে সলিল-হিল্লোলে।"

বেহুলার সে অনন্ত-রূপ দর্শনে এক দুষ্ট ধীবর মুগ্ধ হইল। সে তাঁহাকে আপনার অঙ্ক-লক্ষ্মী করিবার জন্য, মৎস্য ধরিবার উপকরণ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া ভেলা ধরিবার জন্য উন্মাদের ন্যায় নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সহসা এক প্রবল তরঙ্গাঘাতে ধৃষ্ট-বুদ্ধি জালিক কোথায় ভাসিয়া গেল। রূপ-মুগ্ধ ক্ষুদ্র পতঙ্গ অনলে পড়িয়া আত্মবিসর্জ্জন করিল। সতীর *পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা পাইল।*

গোদার বাঁকে ধনা-মনা বড়শীতে মাছ ধরিতে ছিল। তাহারা বেহুলার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে দুই ভ্রাতার মধ্যে তাঁহাকে লইয়া বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। ঘোর তর্ক বিতর্ক—মারামারি করিয়া উভয়ে নৌকাসহ জলমগ্ন হইল। পতি-শব সহ সতীর মান্দাস-তরী তীব্র বেগে ভাসিয়া চলিল।

তারপর এক পাপিষ্ঠ বৈদ্য লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ-দানের মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া সতীকে তীরে আসিতে আহ্বান করিল। বেহুলা

তাহার অশিষ্ট হাব-ভাব দর্শনে অবনত বদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। খর-স্রোতে কদলি-ভেলা দূরে ভাসিয়া চলিল। বিধাতার মঙ্গলময় সূক্ষ্ম বিধানে এইরূপে সর্ব্বত্র বেহুলার পবিত্র সতী-ধর্ম্ম রক্ষা পাইতে লাগিল।

লক্ষ্মীন্দরের শব পচিয়া ধসিয়া গলিয়া পড়িতেছে, শব-মাংস মধ্যে কৃমি-কীট সমূহ ইতস্ততঃ কিলি-বিলি করিতেছে, দুর্গন্ধপ্রিয় মক্ষিকাকুল গলিত শবের বিষম পুতিগন্ধে মুগ্ধ হইয়া নিয়ত শব বেষ্টনপূর্ব্বক 'ভন্ ভন্' করিতেছে, অসহ্য দুর্গন্ধে নদীতীরস্থ লোকেরা বস্ত্রাঞ্চলে নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বেহুলাকে মায়াবিনী পিশাচী জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে। কুম্ভীর কচ্ছপাদি নানাজাতীয় জলজন্তুগণ সেই গলিত শবের পুতি-গন্ধে মুগ্ধ হইয়া ভেলার সঙ্গে সঙ্গে মহা আস্ফালন ও মুখব্যাদান করিয়া বিষম বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে, মাথার উপরে শকুনি গৃধিনী উড়িতেছে, তীরে ফেরুপাল চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, ডাকিতেছে,—এ মড়াটা পাইলে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে; কিন্তু বেহুলার সে দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। তিনি ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় বসিয়া বসিয়া স্বামী-শবস্থ ক্রিমী-কীট সকল বাছিতেছেন, মক্ষিকা তাড়াইতেছেন; আর কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব অভয়-বাণী দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় তাঁহার প্রাণে প্রবেশ করিয়া যেন আশার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়া তাঁহাকে কি এক মোহের ছলনায় কোথায়—কোন্ এক অজ্ঞাত দেব-দেশে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে; বেহুলা তাহা জানেন না, বুঝেন না; অথচ স্বেচ্ছায় মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছেন।

ক্রমে তাঁহার ভেলাখানিও পাত-শবের ন্যায় গলিত দশাপন্ন হইয়া পড়িল। রম্ভাবৃক্ষগুলি সুদীর্ঘকাল জলে থাকিয়া পচিয়া খসিয়া যাইতে লাগিল। বেহুলা পতি-শবদেহটীকে আপনার বুকে আবরিয়া রাখিয়া তাঁহার সকল দুঃখের নিদান মনসাদেবীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভেলাখানি সম্পূর্ণ পচিয়া গিয়াছে, আর মুহূর্ত্ত বিলম্বে বেহুলা অতল জলে ডুবিবেন—তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইবে। সহসা দেবীর কৃপায় তথায় এক নূতন ভেলা ভাসিয়া আসিল। পতিশবসহ সতী তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বেহুলার ভেলা ভাসিতে ভাসিতে মাঝে-মধ্যে নদী-তীরস্থ ঘাটে লাগিত। তখন পর-দুঃখ কাতর সদাশয় গৃহস্থগণ তাঁহাকে ফলমূলাদি বিবিধ খাদ্য পদার্থ প্রদান করিতেন। শোক-বিহ্বলা অশ্রুমুখী বেহুলা তাহা ভক্তি পূর্ব্বক দেবীর নামে নিবেদন করিয়া আপনি সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। পতিগতপ্রাণা সতী কখন কখন সেই খাদ্য পদার্থ সকল আপনার মুখে না তুলিয়া ভাববিহ্বলতা বশতঃ মৃত পতির মুখে গুঁজিয়া দিতেন। এবং স্বামীর তাৎকালিক শোচনীয় অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া শোকে দুঃখে অধীরা হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করতঃ স্বামীর শব-দেহ সিক্ত করিতেন।

নোয়াদার ঘাটে একটা বৃহৎ জলৌকা লক্ষ্মীন্দরের শবদেহ দংশন করিল। অশ্রুমুখী বেহুলা প্রাণপণ যত্নে সেই জোঁক ছাড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু পারিলেন না। জোঁক শব-

মাংস মধ্যে লুকাইয়া থাকিল। বেহুলা মনের দুঃখে অবিরত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে বুদ্ধিমতি সতী জোঁকের মুখের নিকট আপনার কনক-অঙ্গুলি রক্ষা করিলেন। নর-শোণিতের গন্ধ পাইয়া শোণিতলুব্ধ জলৌকা বেহুলার হস্তে দংশন করিল। এইরূপে সতী পতি-শব হইতে সেই সুবৃহৎ জলৌকা বহিষ্কৃত করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিল।

"ধরিয়া মরার গায়ে হানে এক জোঁক।
দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায় বড় শোক॥
ছাড়াইলে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥
অবিরত অশ্রুজল নিবারিতে নারি।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥"

প্রায় ছয় মাস হইল, সতী পতি-শব লইয়া ভেলায় ভাসিয়াছেন। শব পচিয়া খসিয়া এখন অস্থিমাত্র সার হইয়া পড়িয়াছে। বেহুলার আশার শেষ পলিতাটির ন্যায় সেই কঙ্কালগুলি বুকে আবরিয়া জলে ভাসিতেছেন। শীত বাত তাপ-ক্লিষ্টা অনশনক্ষীণা বেহুলার অতি শীর্ণ দেহখানি স্বর্ণ-বল্লরীর ন্যায় কদলি-ভেলায় পড়িয়া আছে। এখন আর তাঁহার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই—মরজগতের কোনরূপ ভাবনা চিন্তাও যেন নাই; এখন আর বেহুলা এ মর্ত্তের মানবী নহেন, নিরাহারা অভিশপ্তা স্বর্গীয়া দেবী।

একদিন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, যামিনীর নিবিড় অন্ধকারে ধরা সমাবৃত। সেই ভীষণ অন্ধকারে এ বিশ্ব যেন একটা বিরাট রাক্ষসের ন্যায় বোধ হইতেছে। প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিজন নদী-বক্ষে উৎকট শব্দ উঠিয়া পিশাচের অট্ট-হাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মাথার উপর অনন্ত শূন্যে বজ্রনাদে মেঘ ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে। শোঁ শোঁ রবে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইয়া সে ভীষণ রজনীকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। নদীতীরে ব্যাঘ্র ভল্লুক ডাকিতেছে, শিবাকুল চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিতেছে। সেই মহা বিভীষিকাপূর্ণ রাত্রিতে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে, সে উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুলা বিজন নদী-গর্ভে মৃত-পতির কঙ্কাল বুকে করিয়া বেহুলা একাকিনী ভেলায় ভাসিতেছেন! মানুষের প্রাণ—কুসুম-পেলব বালিকা হৃদয় আর কত সহিতে পারে? সে বিষম বিভীষিকা দর্শনে ক্ষীণাঙ্গিনী বেহুলা ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছিতাবস্থায় বেহুলা দেখিলেন; "তিনি যেন বিগত সাত জন্ম ধরিয়া এমনি বিবাহরাত্রে বিধবা হইয়া আসিতেছেন। প্রতিবারেই যেন তিনি পতির সহিত সহমৃতা হইয়াছেন—বিবাহের সাজ শাখা সিন্দুর পরিয়া স্বামী সহ চিতার অনলে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সেই পুণ্য ফলে এবার তিনি মৃতের শুষ্ক কঙ্কালে জীবন-সঞ্চার করিয়া—মৃতপতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবেন; তিনি দৈবশক্তি প্রভাবে দেবদেশে যাইয়া তাঁহার নিত্যারাধ্যা দেবীর কৃপায় স্বামীকে ফিরিয়া পাইবেন।" এই অদ্ভুত স্বপ্নের সহিত বেহুলার সেই বিষম বিভীষিকাময়ী যামিনীর অবসান হইল। মূর্চ্ছা-ভঙ্গে তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, ভেলা কেদারেশ্বর ঘাটে।

সেই ঘাটের অদূরে স্বর্ণ রজকিনী নেতা

কাপড় কাচিতেছিল। সে দয়া করিয়া বেহুলাকে স্বর্গে লইয়া গেল। বেহুলা দেব-পুরে দেব-সভায় উপস্থিত হইয়া আনত মস্তকে দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইলেন। তখন বেহুলার প্রতি দেব-সভায় নৃত্য করিবার আদেশ হইল। কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে বেহুলা বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া প্রাণপণ যত্নে দেবতাদের সে নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। তাঁহার প্রতি কঠোর দেব-পরীক্ষার অবসান ও দেব-কৃপা বর্ষিত হইল। শিবের আদেশে শিব-সুতা মনসাদেবী স্বর্গীয় অমৃত সেচনে লক্ষ্মীন্দরের কঙ্কাল-দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। অলকা-পুরীর অমৃতময় বায়ু স্পর্শে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিল।

অতঃপর দেবীর কৃপায় বেহুলা তাঁহার সর্প-দষ্ট ছয় ভাশুরের প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহারা পুনর্জ্জীবিত হইয়া দেবী-পদে প্রণাম করিলেন। দেবী সযত্নে তাঁহাদের মৃত দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় সে সব দেহ নষ্ট হইতে পারে নাই। তিনি কৃপা করিয়া চাঁদের অনন্ত রত্নরাজি পরিপূরিত "চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর" বেহুলাকে ফিরিয়া দিলেন। বেহুলা দেব-সভায় দেবতাদের পায় ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া—দেবীর রাতুল পদে প্রণাম পূর্ব্বক পতি ও ছয় ভাশুর সহ চম্পকনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্বর্গ-দ্বারে আসিয়া সতী চরিত্রে সন্দিগ্ধ লক্ষ্মীন্দর, চির-পবিত্রতাময়ী বেহুলার চরিত্র পরীক্ষার্থ এক অগ্নি পরীক্ষার অনুষ্ঠান করিলেন। পতিব্রতা সতী সে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মীন্দর আপনার এ অন্যায় সন্দেহের জন্য বিশেষ লজ্জিত হইয়া পতিব্রতা পত্নীকে প্রীতি-মধুর সাদর-সম্ভাষণে দেবী জ্ঞানে বুকে আবরিয়া লইলেন। প্রীতি-প্রফুল্ল মনে মাধবী সহকারের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সতীর কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইল।

তারপর লক্ষ্মীন্দর পতিব্রতা পত্নী ও ছয় ভ্রাতা সহ দেবীদত্ত সেই "মধুকরে" আরোহণ করিয়া চম্পকনগরে গাঙ্গুড়ের তীরে—সেই ভেলা ভাসিবার ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শিবের আদেশে চাঁদ মহাসমারোহে মনসা-দেবীর অর্চ্চনা করিয়া পুত্র পুত্রবধূ প্রভৃতিকে গৃহে লইয়া গেলেন। মর্ত্ত্যে মনসাদেবীর পূজা প্রচার হইল। এতদিনে চির-মঙ্গলময় সদা-শিবের অনুগ্রহে চাঁদসদাগরের অশিব নষ্ট হইল। অমঙ্গলের গৃহে মঙ্গলময়ের কৃপায় মঙ্গলের হুলুধ্বনি ও শঙ্খরব প্রতিধ্বনিত হইল। সুদীর্ঘকাল পরে অশ্রুমুখী সনকা এবং তাঁহার ছয় পুত্রবধূর শুষ্ক অধরে আবার হাসির মধুর রেখা ফুটিয়া উঠিল। সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিল,—"জয় মনসাদেবীর জয়!—জয় বেহুলার জয়!!

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বড়ই অদ্ভুত! এত সুখ দুঃখিনী সনকার অদৃষ্টে সহিল না। চন্দ্রধরের জ্ঞাতিগণ সুদীর্ঘ ছয়মাস কাল নিরুদ্দিষ্টা তরুণী বধূ বেহুলার কঠোর পরীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক বোধ করিলেন। স্থির হইল, বেহুলা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলে—সতী লক্ষ্মী বলিয়া গৃহ-

লক্ষ্মীর আসন গ্রহণে অধিকারিণী হইবেন। অন্যথা তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

এ অপ্রীতিকর আলোচনার বিষময় সংবাদ অন্তঃপুরে পঁহুছিল। অনতিবিলম্বে লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া সতী-প্রতিমা বেহুলা সে জ্ঞাতি-সভায় উপস্থিত হইলেন। সতী-দেহ-নিঃসৃত পুণ্য জ্যোতিঃপ্রভাবে সভা-গৃহ উজ্জ্বল হইল। সতী সভাস্থ গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া বীণা বিনিন্দিত মধুর স্বরে, কম্পিত অধরে, যুক্তকরে বলিলেন,—"মৃত পতীর জীবন লাভই আমার এ কঠোর সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেব-কৃপায় আমার সে মহা সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে—আমি আমার মৃত পতিকে ফিরিয়া পাইয়াছি—আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর আমার কোন প্রার্থনা নাই; সুতরাং পরীক্ষারও প্রয়োজন নাই। আমাকে বর্জ্জন করাই ত আপনাদের অভিপ্রেত?—তা আমি স্বয়ংই আপনাদের সে অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি; আপনারা আমার শেষ অভিবাদন গ্রহণ করুন।" কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সেই বিপথমতী বেহুলার সোণার দেহ হইতে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় জ্যোতিঃশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। সে অপূর্ব্ব জ্যোতিতে মুহূর্ত্তে সভাগৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বেহুলা ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সহসা কি জানি কোন্ মায়া-মন্ত্রে পরিচালিত হইয়া লক্ষীন্দরও ভূতলশায়ী হইলেন। উভয়ের দেহ-জ্যোতিঃ এক স্বর্গীয় জ্যোতির সহিত মিশিয়া ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে উঠিয়া অনন্ত স্বর্গে প্রস্থান করিল। দুইটি পুণ্য-জ্যোতিঃ একত্র সম্মিলিত হইয়া একবারে এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। সব ফুরাইল। এ বিশ্বে সতীত্বের বিজয়-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। তখন ভুবন গায়িল;—

"পতিব্রতা সতী কন্যা শুদ্ধ হইয়া দেখ।
স্বামী সঙ্গে স্বর্গে গেল না বুঝিল এক ॥
তারার সঞ্চার হেন উঠিল গগনে।
দেখিয়া সভার লোক ধন্য ধন্য মানে ॥
আকাশে দুন্দুভী বাজে পুষ্প বরিষয়।
বিস্ময়ে গায়িল বিশ্ব জয় সতী জয় ॥"

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

হিন্দু-রাজার আদর্শ।

"যদিনস্যান্নরপতিঃ সমম্ন্নেতা ততঃপ্রজা।
অকর্ণধারাইব জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব ॥"

হিন্দুরাজার আদর্শ অনৈতিহাসিক কাল হইতে গঠিত হইয়াছে। কত যুগ প্রলয়, কত বিপ্লব, কত পরীক্ষা, কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত সংঘর্ষ, কত অনুকূল, কত প্রতিকূল ঘটনাচক্র ইহাকে আকার প্রদান করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও চিন্তা স্তম্ভিত হইয়া যায়।

হিন্দুগণ রাজাকে লোকস্থিতি,সমাজ-স্থিতির মূল জানিয়া তাঁহাকে "নরনাথ" এই আখ্যা-প্রদান করিয়াছেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন—"যেমন কর্ণধার বিহীন নৌকা দিগ্ হারা হইয়া সমুদ্রে বিপদগ্রস্ত হয়, রাজা সম্যক্ প্রকারে নেতা না থাকিলেও লোকদিগের তদ্রূপ দশাই হয়" রাজা লোক সকলের ধর্ম্মার্থ কাম এই ত্রিবর্গরূপ সর্ব্ববিধ

মঙ্গলের সম্যক্ বিধান দ্বারা রক্ষা কর্ত্তা বলিয়াই "নৃপ" হইয়াছেন। সমাজের সুখ, সম্পদ, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, রীতি, নীতি' ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতির রাজাই আশ্রয়। প্রথম রাজা যে অনন্য সাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রাধান্যের কারণ হইয়া তাঁহাকে 'নরেন্দ্র' অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত করিয়াছিল। এই অনন্য সাধারণ শক্তি ক্রমে অলৌকিক শক্তিরূপে নিরীক্ষিত হইয়া রাজাতে দেবত্ব বুদ্ধির উৎপাদন করিলে তখনই তিনি "নরদেব" এই নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার শক্তির আধিক্য ও তেজের আধিক্য যতই লক্ষিত হইতে লাগিল, ততই ইহা স্বাভাবিক ধারণা হইতে লাগিল যে শ্রেষ্ঠ দেবভাবের দ্বারা রাজা অবশ্য অনুপ্রাণিত হইয়াছেন নতুবা তিনি এরূপ ভাবে সমস্তকেই অভিভূত করিতে পারিবেন কেন? তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভি-ভবত্যেষ সর্ব্ব ভূতানি তেজসা॥"

"রাজা অষ্ট শ্রেষ্ঠ দেবতার অংশ দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়াই সমস্ত ভূতকে তেজের দ্বারা অভিভূত করেন।" এই প্রকারে হিন্দুগণ, রাজার যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাকে খর্ব্ব বা হীন করিতে তাঁহারা কখনও ইচ্ছা করেন নাই, প্রত্যুত ইহাকে অবিকৃত রাখিতে—উজ্জ্বল করিতেই তাঁহারা সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য, কাব্য, নাটক প্রভৃতি সমস্ত সাহিত্যে আমরা সেই আদর্শই মুদ্রিত দেখিতে পাই। এক্ষণে আমরা এই আদর্শের ক্রমবিকাশ যথা সম্ভব সংক্ষেপে অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

মনু।

মনু (নৃপতি) মানসিক শক্তির উৎকর্ষ
পিতৃভাব—সমাজ সৃষ্টি।

বৈবস্বত মনুই হিন্দু রাজার আদি রাজা। তিনি যে বিশেষ মনস্বী ছিলেন, তাঁহার নামই প্রমাণ দিতেছে। মনু মন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন, মন শব্দও এই মন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। মানসিক শক্তির উৎকর্ষ হেতুই তিনি আধিপত্য লাভ করেন, ইহাই তদীয় নামের মর্ম্ম বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি। মানব ও মনুষ্য—মনুরই সন্তান বলিয়া কথিত।

মনুর সময়ই প্রথম চিন্তা শক্তির বিশেষ বিকাশ দ্বারা মনুষ্য সাধারণ জীব হইতে বৈলক্ষণ্য লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সমাজ বন্ধন করিয়া একটী একতন্ত্র ভাবের সৃষ্টি করে। ইংরাজি 'Man' শব্দটী মনু শব্দের অধিক নিকটবর্ত্তী এবং ইহাতে চিন্তাশীলতার ভাবটী অধিক সুব্যক্ত। মনু মহাপ্লাবন হইতে মনুষ্য জাতির উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইনিই প্রথম 'নৃপতি'। ইঁহাতে রাজার পিতৃভাব প্রথম প্রকাশিত—তাঁহাতেই মানব বা মনুষ্য মাত্রেই তাঁহার সন্তান। মনুর সম্বন্ধে কবি কালিদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের উক্তির অনেক সমর্থন হইবে।

"বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।
আসীম্মহীক্ষিতা মাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব॥"

"জ্ঞানিদিগের সম্মান পাত্র বৈবস্বত মনু ক্ষিতিপতিদিগের আদি ছিলেন।"

পৃথু (ভূপতি) অধিকার বিস্তার।

মনুর পর পৃথু। ইঁহার নামের অর্থ-বিস্তার প্রাপ্ত হওয়া। মনুর সময় লোক সকল এক-স্থানেই সন্নিবিষ্ট ছিল। পৃথু তাহাদিগকে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে প্রবর্ত্তিত করেন। মনুর সময়ে মনুষ্যদিগের পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান স্বস্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল, পৃথুই প্রথম স্ববাসস্থানের বাহিরেও যে এই ধরণী সুদূর বিস্তৃত, তাহা শিক্ষা দেন। পৃথু মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তাহাতে বীজ প্রোথিত করিয়া শস্যোৎপাদনের উপায় প্রথম উদ্ভাবন করেন। ইহা কতকটা পার্ব্বতীয় জুম প্রথার অনুরূপ বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই শস্য-বপনের দ্বারা পৃথিবীতে অধিকার বিস্তার, তাঁহারই দ্বারা প্রথম হয়। শস্যোৎপাদনের জন্য ভূমি গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই লোক সকল ইহার বিশাল বিস্তার বুঝিতে পারিল। তখন পৃথুরই নামে ইহার নাম পৃথিবী পৃথ্বী প্রদান করিয়া ইহার "বিস্তারশীলা" ও "পৃথুর অধিকৃতা" এই উভয়ার্থই প্রচারিত করিল *। সুতরাং পৃথুই প্রথম ভূপতি হইলেন। পৃথুই সর্ব্ব প্রথম পৃথিবীর উর্ব্বরতাশক্তির পরিচয় পাইয়া ইহা হইতে বীজ বপনের দ্বারা শস্য-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি পৃথিবীকে দোহন করেন এরূপ পৌরাণিক কথা প্রচলিত আছে।

"পিতামহ নিয়োগেন দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ॥"

কূর্ম্ম পুরাণম্।

* "পৃথিবী পৃথুকন্যাত্বা-দ্বিস্তৃতত্বান্মহামুনে।"

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ৭ অঃ।

জনক (রাজা) জ্ঞানোৎকর্ষ।

এক্ষণে রাজর্ষি জনকের আবির্ভাব। ইহা ঋষিযুগ—তখন বেদসকল বিরচিত হইয়াছে। প্রবল জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য ঋষিগণ বেদের দর্শন—উপনিষদ্ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মনুষ্য-জ্ঞানের চরম-সীমা এই সময়েই ঋষিগণ প্রাপ্ত হন।

পৃথু মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তাহাতে বীজবপন করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। জনক হল-কর্ষণ যোগে বীজ-বপন প্রথা প্রচলিত করেন। ইহাতে শস্যোৎপাদন প্রথার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

জনকই প্রথম 'রাজ' শব্দ বাচ্য হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি। জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরাজমান অর্থাৎ শোভিত হইয়াই তিনি এই আখ্যা লাভ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার নামের সহিতই আমরা রাজ শব্দের বিশেষ যোগ দেখিতে পাই। তিনি রাজা অথচ ঋষি। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে প্রাথমিক রাজা ও পুরোহিত ভাব যেন তাঁহাতে একাধারে মিলিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ক্ষত্রিয়-ভাব প্রবল হইয়া যখন ব্রাহ্মণ্যভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হওতঃ স্বতন্ত্র রাজ-ভাব ধারণ করিল, তখনও আমরা যে ব্রাহ্মণের রাজ-মন্ত্রী হওয়ার শাস্ত্রবিধি দেখিতে পাই, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পৌরোহিত্য-প্রভাবেরই নিদর্শন পাওয়া যায়।

রাজ বাচক ইংরেজি (King) শব্দটীর 'জনক' শব্দের সহিত মূলগত যোগও বিশেষরূপে বিবেচ্য। যদি কেহ রাজর্ষি জনকের হলকর্ষণ ও জ্ঞান-গরিমার মধ্যে অসামঞ্জস্যের ভাব

দেখিতে পান তবে তাঁহাকে আমরা গ্রীসের ডিক্টেটর (Dictater) দিগের কথা স্মরণ করিতে বলিব।

কার্ত্তবীর্য্য বলোৎকর্ষ ক্ষত্রিয়ভাববিকাশ দণ্ডধরত্ব।

জনকের পর কার্ত্তবীর্য্য। কার্ত্তবীর্য্যে আমরা প্রথম ক্ষত্রিয় বল প্রখ্যাপনের প্রমাণ পাই। তাঁহার নামটীই এতৎপক্ষে প্রথম প্রমাণ। তাঁহার সহস্র বাহুরও ইহাই অর্থ বলিয়া বোধ হয়। তদীয় সহস্র বাহু যে কেবল অমিতবলেরই দ্যোতক মহাকবি কালিদাস তাহা স্পষ্টরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—"সংগ্রাম নির্ব্বিষ্ট সহস্র বাহুঃ।" রঘুবংশম্। অর্থাৎ—আমরা সাধারণ কথায় যে বলি "তিনি একাই এক-সহস্র" কার্ত্তবীর্য্যও সংগ্রামে একাই একসহস্র ছিলেন।

কার্ত্তবীর্য্য কেবল অতুলনীয় প্রতাপশালী ছিলেন তাহাই নহে, পরন্তু তিনি প্রবল শাসন কর্ত্তাও ছিলেন। রাজার দন্তধর ভাব যেন তাঁহাতে মুর্ত্তিমান্ হইয়াছিল। কালিদাস রঘুবংশে তদীয় এই আদর্শ দন্তধর ভাবের প্রশংসা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহার শাসন বলে লোকে দুষ্কার্য্য করা তো দূরের কথা দুষ্কার্য্যের চিন্তা পর্য্যন্তও করিতে সাহসী হইত না, কারণ দুশ্চিন্তার সমকালেই তদীয় দণ্ডধর মূর্ত্তি মনে উপস্থিত হইয়া পাপ চিন্তাকে দমিত করিয়া দিত :—

"অকার্য্য চিন্তা সম কালমেব,
প্রাদুর্ভবংশ্চাপ ধরঃ পুরস্তাৎ।
অন্তঃ শরীরেষ্বপি যঃ প্রজানাম্,
প্রত্যাদিদেশা বিনয়ং বিনেতা॥"

৬-৩৯ রঘুবংশম্।

তদীয় শাসনের এই অদ্ভুত প্রভাব এরূপই অলৌকিক সংস্কারে পরিণত হইয়াছে যে তাঁহার নাম করিলে হারাণ বস্তু পাওয়া যায় ইহা এখনও লোকের বিশ্বাস।

(ক্রমশঃ) শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বীণা।

পুত্র রমানাথ—যখন জীবনের মহাযাত্রার পথে বৃদ্ধ রামচরণকে একা ফেলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সেই দিন বৃদ্ধ রামচরণের বুকে যে শোকের শেল বাজিয়াছিল, তাহা চিরকাল তাঁহার মনে রহিল, এই মহাশোকের কথা ভুলিবার জন্য বৃদ্ধ কলিকাতায় একটী কারবার লইয়া থাকিতেন, কিন্তু গৃহের একটী অতি ক্ষুদ্র বন্ধন, রমানাথের পিতৃমাতৃহীন কন্যা বীণা তাঁহাকে গৃহে আকর্ষণ করিয়া আনিত, মধ্যম পুত্র হরিভূষণ ও তাহার পত্নী নিরুপমার জন্য বৃদ্ধের মন ততটা কাতর হইত না, যত খানি বীণার জন্য হইত। এই নিঃসহায় বালিকাটীকে বৃদ্ধের মৃত্যু-আহত স্নেহ অত্যন্ত নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল।

জীবনের সূর্য্য যখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছিল এবং মৃত্যুর ছায়া দিন দিন গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। যখন শোকাহত বৃদ্ধের হৃদয় মহাশক্তির প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময় কোথা হইতে এই মায়াবিনী তাহার

মৃদু অঙ্গুলি-আঘাতে সংসারের সহিত তাঁহার এই অভিনব বন্ধন সৃজন করিয়াছিল, বৃদ্ধের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে, সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে একটী অপরূপ শ্রীসম্পন্ন সুকুমার আনন বারম্বার ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, তাই বৃদ্ধ তাহার ভাব তাড়নে অস্থির হইয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া পড়িত এবং তাহার পরদিন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গৃহের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া ডাক পাড়িত—দিদি!

বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে, শরতের বর্ষণ-ক্লান্ত, রৌদ্র-বঞ্চিত লঘু মেঘগুলি ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছিল, নদীর কূলে বিকশিত কাশ-পুষ্পগুচ্ছ নদীর জলে হেলিয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এই সময় রামচরণ আপন কারবার বন্ধ করিয়া গৃহে আসিলেন। দ্বিপ্রহরে বীণা বৃদ্ধকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইত। আর প্রশ্ন করিত—দাদামহাশয়! কৈকেয়ী রামকে বনে দিল—তাহা তাহার প্রাণে একটুও বাজিল না?

বৃদ্ধ বলিলেন—তার প্রাণে না বাজিলে আর কি করিবে বোন্।

বীণা বলিল—কিন্তু দাদামহাশয়, আমার বড় কান্না পায়। আমি আর পড়িব না, বলিয়া রামায়ণ বন্ধ করিত।

আজ দশ দিন রামচরণ সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া এক অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। দুপুর বেলা হরিভূষণ ব্যাগ হাতে বাটীতে ঢুকিল, চোখ দুটী বসিয়া গিয়াছে, মাথার চুল অবিন্যস্ত। ঘরে ঢুকিয়া ধপ্ করিয়া চৌকীর উপর বসিয়া পড়িল, নিরুপমা অদূরে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল?

হরিভূষণ—হবে আর কি? সব গেল—কলিকাতার কারবার গিয়েও পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনা হইয়াছে।

নিরুপমা বসিয়া পড়িল। বলিল—উপায়!

হরি—উপায় আর কি? পথে দাঁড়ান।

নিরুপমা—হরি হে, ইহাও কপালে লিখিয়াছিলে, বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রামচরণের যে সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, ক্রমে তাহাতে হাত পড়িল, পিতার জীবদ্দশাতে হরিভূষণের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল, পিতার মৃত্যুর পর তাহা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, সংসারে নানা রকম অসুখ দেখা দিল, স্বামীর বিপক্ষে নিরুপমা কোন দিন কোন কথা বলে নাই, বলিতে গেলে স্বামী যে তাহার প্রতি নানা অত্যাচার করেন। সে এ সমস্ত কষ্ট মনে চাপিয়া রাখিত, যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিত, একান্ত অপারক হইত, তখন নিরুপমা একমাত্র স্নেহের আস্পদ বীণাকে বুকে জড়াইয়া রোদন করিত। সন্তান হইতে বঞ্চিতা এই অভাগিনী নারীর একমাত্র সান্ত্বনার স্থল উহা, তাহার সংসারে যে কালান্তক ঝটিকা উঠিয়াছিল, তাহারই করাল স্পর্শ হইতে বীণাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য অভাগিনী আপনাকে তাহার নিকট বলিদান দিয়াছিল।

সেদিন সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে কোথা হইতে হরিভূষণ আসিয়া বলিল—"একবার চাবিটা দাও দেখি।" নিরুপমা বলিল—"কেন?" ক্রুদ্ধস্বরে হরিভূষণ কহিল—"প্রয়ো-

জন আছে, টাকা নেবো।"

নিরুপমা—কিসের জন্য টাকা নেবে ?"

মুখভঙ্গি করিয়া হরিভূষণ কহিল—"মদ, মদের জন্য।" নিরুপমা চাবির গোছা মুটা করিয়া ধরিয়া কহিল—"চাবি আমি দেবো না, বীণা বড় হয়েছে, আগে তার বিবাহ দাও, তবে টাকা পাবে। হরিভূষণ বিকট চীৎকার করিয়া কহিল—"বীণার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নেই। সে মরুক, না হয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাক, সে মরিলে আমার মদ খাওয়ার সুবিধা হবে। তুমি আজই তাকে বের ক'রে দাও, তার রূপ আছে,সে—" দুই হাতে নিরুপমা হরিভূষণের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ওগো, তোমার পায়ে ধরি, অমন কথা বলিও না। সে তোমার মেয়ে।" বলিয়া চাবির গোছা ফেলিয়া দিল। হরিভূষণ চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

বীণা সব শুনিয়াছিল, সে ঠাকুরের কাছে মাথা খুঁড়িয়া বলিল—"ঠাকুর, তাহা কেন হয় না, আমি মরি না কেন ? দাদামশাই, তুমি অনেক দিন গিয়াছ, আজ আমাকে তোমার কাছে ডেকে লও, আমি আর পারি না।

একটা কথা আছে দীনের প্রার্থনা ভগবান শোনেন। সেই রাত্রে বীণা জ্বরে পড়িল। প্রথম প্রথম কাহাকেও বলে নাই, শেষে যখন জ্বর ধরা পড়িল, তখন প্রায় তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইতেছিল। এমনি করিয়া দশ দিন কাটিল। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হইল না। নিরুপমা সমস্ত দিন রাত্রি তাহার শিয়রে বসিয়া থাকিত, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা বীণা উঠিয়া বসিয়া বলিল—"কাকি-মা !

"কেন মা !"

"কাকা কোথায় ? কাকা কি এসেছিলেন ?"

নিরুপমা—না মা, তুমি ঘুমোও।

বীণা হাসিয়া বলিল—"কাকি-মা ! কাকি-মা ! ঐ দেখ দাদামশাই !"

নিরুপমা হাত জোড় করিয়া বলিল—"ঠাকুর, একি হ'ল ?

বীণা—কাকি-মা,কাকাকে একবার দেখিব, তিনি কি আসিবেন না ?

নিরুপমা—তুমি চুপ করে শোও, তিনি আসিতেছেন।

সেদিন হরিভূষণ তাহার সঙ্গীগণের নিকট হইতে দারুণ অপমান-দগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে যাহাদের প্রত্যয় করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, তাহারাই আজ এমনি করিল,অপমানের ধিক্কারে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, হরিভূষণ বাটীতে আসিয়া এই সকল ভাবিতেছিল—এমন সময় নিরুপমা তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আমার একটী কথা শুনিবে ?" হরিভূষণ নিরুপমার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল—"শুন্‌ব,কি বল ?" নিরুপমা তখন বলিল—"তুমি একটীবার বীণার কাছে যাও, সে বোধ হয় আর বাঁচে না।" সহসা হরিভূষণের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। "বীণা বাঁচে না—এ কথা কেন আমাকে পূর্ব্বে বল নাই ? বীণা না বাঁচিলে কাকে নিয়ে আমরা সংসারে থাকিব।" আজ বহুদিনের পর রোগীর শয্যা-পার্শ্বে হরিভূষণ আসিয়া বসিল। সে যতবার বীণাকে ডাকিবার চেষ্টা করিল, ততবারই তার চোখের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর

বাহির হইল না। হরিভূষণ অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, আজ এই মুমুর্ষের দুর্ব্বল হস্ত তাহার বক্ষে অনাবিল প্রেমের যে নিগড় বন্ধন সৃজন করিয়া দিয়া আপনি সরিয়া পড়িতেছিল, তাহারই বেদনা আজ তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। হরিভূষণ গলা ঝাড়িয়া ডাকিলেন—"বীণা!" চকিতে একবার চোক চাহিয়া বীণা ডাকিল—"কাকা!" তারপর যেন সে কাহার প্রসারিত বাহুর মধ্যে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। হরিভূষণ উন্মাদের মত তাহাকে জড়াইয়া ডাকিলেন—"বীণা! মা আমার! আর কি ফিরিয়া আসিবে না!

মৃতের মুখে মহানন্দের অপূর্ব্ব মঙ্গল জ্যোতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

পল্লী-বধূ।

অরুণ-রথে আসল যবে কিরণ-করে তরুণ রবি,
তিমির ঘেরা আকাশ-পটে ভাসল যবে সোনার ছবি।
কবি যখন ভাবের ঘোরে উঠল জেগে স্বপন ছাড়ি,
'বন্দর' ব'লে নাবিক যখন তপন-ভয়ে ছাড়ল তরি।
শাখীর শাখে পাখী যখন আঁখি মুদে গীতি গায়,
আপন পতি হীনদ্যুতি কুমুদ যবে দেখ্‌তে পায়।
সেই সময়ে শয্যা ছাড়ি উঠলে কে গো পল্লী-ঘরে,
করলে রম্য গৃহের মাঝার সংমার্জ্জনী লয়ে করে?
সুপবিত্র করলে আবার মৃজ্জলেতে ক'রে লেপন,
হাসল যেন গৃহখানা নূতন জীবন ক'রে ধারণ।
সাঙ্গ করি গৃহকর্ম্ম ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে,
প্রাঙ্গনেতে এসে দিলে গোবর ছড়া যত্ন ক'রে।
সমাপিয়ে সকল কর্ম্ম কলসী নিয়ে কক্ষ-মাঝে,
স্নানের তরে চল্‌লে সরে শিথিল দেহ মলিন সাজে।
শেষ করিয়ে অবগাহন আর্দ্র-বস্ত্রে এসে ঘরে,
নবীন বসন ক'রলে ধারণ ধর্ম্মদেবে প্রণাম ক'রে।
কবরীতে আবরিয়ে বিলম্বিত চিকুর দাম,
সিন্দুরেতে বিন্দু কাটি করলে শোভ্য ললাট ধাম।
উঠল তপন গগণ মাঝে জাগল যবে পূজ্যগণ,
প্রণমিল পুণ্যময়ি! ভক্তিভরে তাঁদের চরণ।
তুমিই ধন্যা ভুবন মাঝে অয়ি দেবি! ধর্ম্মশীলে!
তোমার তরেই সুখ-শান্তি নিত্য রাজে ধরাতলে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ।

বঙ্গে কৃষির দুর্দ্দশা।

আমাদের দেশে কৃষির ক্রমিক দুর্দ্দশা দিন দিন ঘটিতেছে—তাহার কারণ কি? ইহা নিরূপণ করিবার সময় আসিয়াছে, কারণ আমাদের জীবন সংগ্রাম দিন দিন তীব্রতর হইতেছে বলিয়া এই সমস্যার আশু মিমাংসা করা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হয় অবাধ গো-বধ, কৃষি পদ্ধতিতে কৃষককুলের অজ্ঞতা, মাটী, বীজাদি পরীক্ষার অব্যবস্থা, সমগ্র দেশে সুপুষ্টবীজ-প্রাপ্তির অভাব এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনাদি যে কৃষির অবনতির মূল, এ বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ করি।

এখন আমাদের দেশে সে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য নাই, যুবতী বিবাহ আমাদের দেশের লোককে স্বার্থপর এবং অন্তঃসার শূন্য করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন কালেও যে যুবতী বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহাভারতে এরূপ উদাহরণ আমরা ভুরি ভুরি দেখিতে পাই; কিন্তু তখনকার সমাজ ও শিক্ষা এবং এখনকার পাশ্চাত্য জড়-জাগতিক শিক্ষা ও সমাজ গঠনে যে বহু প্রভেদ, তাঁহা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

বাঙ্গালী দুর্ব্বল হইতেছে কেন? একমাত্র বালিকা-বিবাহই যে ইহার কারণ, ইহা আমাদিগের পাশ্চাত্য সভ্যতালোক প্রাপ্ত সমাজ ধুরন্ধরগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহারা যদি বালিকা-বিবাহের দোষ না দিয়া, বালিকার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করাই বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতার কারণ বলিতেন, তাহা হইলে আমরা কোন কথাই উত্থাপন করিতাম না।

আমরা বলি একমাত্র বাবু হওয়াই বা বাবু হইয়া সাহেব সাজাই বাঙ্গালী জাতির দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতির কারণ। এই বাবুত্ব ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা হইতেই দেশে আজ এত অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। বাবুত্ব হইতেই যত বিলাসিতার উৎপত্তি, যত সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞান, যত কামনার চরিতার্থতা। আমরা বারবার বলিয়া আসিযাছি, এ ত্যাগের দেশে ভোগ সহিবে না, ভোগের অনুশাসনই এ দেশের চিরন্তন ধর্ম্ম। ভোগ স্পৃহাকে যাঁহারাই জাগাইয়া তুলিতে যাইবেন, তাঁহারাই বিফলমনোরথ হইবেন। এ দেশের মানসিক গঠন, ভোগের অনুকুলে নহে, পশুত্বের দিকে নহে। নিবৃত্তিই ইহার বিধি নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

এহেন শস্য শ্যামলা, বনরাজিনীলা, গঙ্গা-স্নেহ-ধার পরিপ্লাবিতা বঙ্গভূমির সন্তানগণ আজ দাসত্বজীবি ও ভিখারী কেন? রাজার ছেলে আজ কাঙ্গাল কেন? অলসতা এবং বিলাসিতাই কি ইহার কারণ নহে? এমন সচ্ছলতার দেশে অভাব আসে কেন? কারণ দেশের প্রতি আমাদের অনুরাগ নাই, বাংলার মাটীর সঙ্গে আমাদের যোগ নাই, বিদেশকেই আমরা সর্ব্বস্ব করিয়াছি, বৈদেশিক এবং বিদেশীয় রীতি-নীতিতেই আমরা অভ্যস্থ হইয়াছি—মজিয়া আছি।

বরূপণ আমাদিগের বাবুত্বেরই একটী বিষময়

ফল। আবার বরপণ হইতেই যুবতী বিবাহের সৃষ্টি। একমাত্র যুবতী বিবাহ হইতেই বাংলার অন্তঃপুরের আজ আমূল পরিবর্ত্তন। যুবতী বিবাহ হইতেই বাংলার একান্নবর্ত্তী পরিবার-মূলে কুঠারাঘাত। যুবতী হইয়াই স্নেহলতা, নিভাননী প্রভৃতি আত্মঘাতিনী হইয়াছে। যুবতী বিবাহ দ্বারাই বাংলার আজ নাবালক ছোট ভাই, বড় ভাইয়ের নিকট ভাত পাইতেছে না। যুবতী বিবাহ দ্বারাই আজ বৃদ্ধা জননী উপযুক্ত পুত্রের নিকট হতাশ হইতেছেন। বাঙ্গালীর সংসারে এত মামলা-মোকদ্দমা, অশান্তি-কলহ হইতেছে কেন? যুবতী বিবাহ ইহার কারণ নহে কি? উদ্ধত স্বভাবা, উচ্চশিক্ষিতা, নব পরিণীতা যুবতী পত্নীর প্ররোচনা দ্বারা এ সকল ঘটিতেছে না কি? ভ্রাতৃবিচ্ছেদের একমাত্র কারণ—যুবতী বিবাহ। কুমারীর আত্মহত্যার একমাত্র কারণ—যুবতী বিবাহ—গৃহবিচ্ছেদের নিগূঢ়তম কারণ—যুবতী বিবাহ। ইহা আমাদের কল্পনার কথা নহে, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতার কথা। একে যুবতী তাহার উপর উচ্চশিক্ষিতা, দেবর শ্বশুর শাশুড়ীকে পথে বসাইবার ও স্বামীকে বানর করিবার এমন দ্বিতীয় কল-কাঠি আর নাই।

তবে যুবতী বিবাহের উপকারিতা কি? ইহার উত্তরে অনেকে বলিয়া থাকেন, ভারতের ভবিষ্যৎ একমাত্র যুবতী বিবাহের উপর নির্ভর করিতেছে, ভারতের ক্ষীণকায় বাঙ্গালী জাতি বলিষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, যুবতী বিবাহে বাঙ্গালীর নবজীবন আসিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, বীরকেশরী শিবাজীর জননীর কত বয়সে বিবাহ হইয়াছিল? ছাড়িয়া দিলাম না হয় ছত্রপতি শিবাজীর কথা। বঙ্গের বীর সন্তান সুরেশ বিশ্বাস, বঙ্গের বিবেকানন্দ, স্যার আশুতোষ প্রভৃতির জননীর কত বয়সে বিবাহ হইয়াছিল? দোষ বালিকা-বিবাহের নহে, দোষ আমাদিগের অসংযত স্বভাবের, দোষ আমাদিগের বর্ত্তমান সংসর্গ ও শিক্ষার! যুবতী বিবাহই দাও, আর বিধবা বিবাহই দাও—দেশ হইতে কামপশুর সৃষ্টি উঠাইতে পারিবে কি? যত দিন দেশে কামপশুর প্রাধান্য থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালী ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে। যুবতী বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি অধম বিবাহ। কাম চরিতার্থতাই এই সব বিবাহের স্বধর্ম্ম। ইহাতে মহাদেবের মত স্বামী লাভের জন্য নারীশিরোমণি গৌরীর তপস্যা নাই। এই সব বিবাহে কুমার সম্ভবের কোন সম্ভাবনা নাই। এই সব বিবাহ হইতে দুশ্চরিত্র কুলাঙ্গারগণই জন্মিবে, কামপশুই বৃদ্ধি পাইবে, জাতির নৈতিক বল একেবারে লোপ পাইবে। সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের মত পুত্র, এই ত্যাগ ভূমিতে আর জন্মিবে না। এত দুর্দ্দশাতেও এখন এদেশে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাক্ষাৎ শঙ্কররূপী মহাত্মাগণ জন্মিয়া থাকেন। কাম কলুষিত যুবতী বিবাহ দ্বারা বুঝি বঙ্গের সে আশা ভরসা টুকুও ফুরাইতে বসিল। এইরূপ বিবাহে বিকৃত রুচির শিক্ষিত চতুর ব্যক্তি অনেক জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রবান মহাপুরুষ জন্মিবে কি? মহাপুরুষগণের জননীগণকে সৎপুত্র লাভের জন্য তপস্যায় বসিতে হয়, তাঁহারা বালিকা বয়স হইতেই গৌরীর ন্যায় কঠোর শিবপূজায় চিত্তকে সংযত ও সমাহিত

করেন। ভাল পিতামাতার যে মন্দস্বভাবসম্পন্ন পুত্র জন্মে, ইহার কি কোন কারণ নাই? নব নারীর পূত সম্মিলন cattle breeding নহে। একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্মেষের উপরই যে সুসন্তান প্রজনন নির্ভর করিতেছে—তাহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি? বিবেকানন্দের ন্যায় পুত্রের জন্ম, মাতার অল্প তপস্যার ফল নহে। বিবেকানন্দের জননীকে একালের বিদ্যাধরীদের ন্যায় নভেল পড়িয়া বা উল বুনিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয় নাই! একমাত্র নৈতিক বলই কি বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের জননীগণের প্রকৃষ্ট শিক্ষা ছিল না?

যুবতী বিবাহে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় বটে কিন্তু সমষ্টির পুষ্টি হয় না। একমাত্র বালিকা বিবাহ ছাড়া সমষ্টির পুষ্টি হইতে পারে না—সংসারে সকলের প্রতি টান আসে না। কেবল স্বামী স্ত্রী লইয়াই হিন্দুর একদেশদর্শী সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ নহে। পঞ্চ-যজ্ঞময় হিন্দুর সংসার, পোষা পাখীটি, পোষা বিড়ালটী পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকে না। একান্নবর্ত্তী পরিবারকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ৮ম হইতে ১০ম বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহের প্রয়োজন। ১০ম বৎসর হইতে তাহার যুবতী না হওয়া পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে অথবা পিতৃগৃহে শিক্ষা-নবিশী করা একান্ত প্রয়োজন। বালিকা বয়সে বিবাহ হইলেই সে শ্বশুর শাশুড়ীর বাধ্য হইতে শিখে, স্বামীকে একমাত্র পরম গুরু বলিয়া জ্ঞান করে, গৃহস্থালীতে মন দিতে অভ্যাস করে। ক্রমে ক্রমে শ্বশুরবাড়ীর নূতনত্বের ক্লেশ তাহার সবই সহিয়া যায়। কিন্তু যুবতী বিবাহে, যুবতী পত্নীর গৃহ-প্রবেশমাত্রেই ছোট দেবরটী পর হইয়া যায়, শ্বশুর শাশুড়ী একটা গলগ্রহের মতন ঠেকে, কেবল স্বামী ও স্ত্রীতে থাকিব, ইহাই ইচ্ছা হয়। এ হেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ একটা পরাধীন জাতির মরণের পূর্ব্ব লক্ষণ নহে কি? আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি, সমষ্টির পুষ্টিকর পথই আসল পথ—একান্নবর্ত্তী পরিবারই একটা জাতীয় জীবনের ইষ্টক এবং ভিত্তি। সমষ্টিই জীবন, ব্যষ্টিই মৃত্যু। হট্ট মন্দির বা হোটেলে বাস ভারতবাসীর নহে, ইউরোপীয়গণেরই উপযুক্ত। আমাদিগকে মধু-চক্রের মত সংসার রচনা করিতেই হইবে। যুবতী বিবাহ বাঙ্গালীর সোনার দেউল ভাঙ্গিয়া দিতেছে। যুবতী বিবাহ উঠাইতে হইলে, বাঙ্গালীর পৈশাচিকতা বরপণ উঠাইতে হইবে।

আবার একান্নবর্ত্তী পরিবারের ছাঁচে বাঙ্গালীর সংসার চালিতে গেলে বালিকাগণকে যথাসময়ে বিবাহ দিতে হইবে। এই বালিকা-বিবাহকে স্থায়ী করিতে হইলে আমাদিগকে সহরবাস ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিয়া পল্লী জননীর শান্তিময় স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় লইতে হইবে। দেশের যাহাতে অভাব দূর হয়, সচ্ছলতা বাড়ে, মিতব্যয়িতা আসে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের যাহাতে ধন ধান্য ও গোধন বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। বাবুগিরি, বিলাসিতা বা আলস্যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখস্বাদ দেশে ফিরিবে না। এক দেশদর্শিতা বা ব্যক্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত না করিতে পারিলে বাঙ্গালীর মরিচা ধরা জড়ত্বে জীবনের স্পন্দন আসিবে না। যৌবন বিবাহের

প্রশ্রয় দান বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের পক্ষে আদৌ হিতকর নহে, ইহাতে অবশ্যম্ভাবী গৃহ-বিচ্ছেদ ও সমষ্টির অনিষ্ট ঘটিবেই। বাঙ্গালী, বাঁশ কচি কচি থাকিতে থাকিতে নোয়াইয়া লও, বাঁশ পাকিলে আর নোয়াইতে পারিবে না।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে আমাদিগের স্ত্রীজাতি ক্রমশঃই যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বেকার নারী-জীবনে একটা ব্রত ছিল, এখন সে ব্রতের পাঠ উঠিয়া গিয়া কেবল উপরের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য প্রসাধনের দিকেই নবীনাগণের নজর পড়িয়াছে। অগ্রে নারী জাতি পতিব্রতা ছিলেন, এখন পতিব্রতা যত হউক আর না হউক, পতিকে কেমন করিয়া বশে রাখিবে, ইহাই নবীনাগণের একমাত্র চেষ্টা হইয়াছে। ফলে তাহাদিগের নানারূপ সৌন্দর্য্য-অভিজ্ঞান ও কলা-কৌশল বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু সুনীতি ক্রমশঃই নবীনাগণের জীবন হইতে বিদায় লইতেছে।

নবীনাগণের ভিতর যতই পাশ্চাত্য মোহ প্রবেশ করিতেছে, ততই তাহাদিগের জীবনের স্বাধীনতা প্রসার লাভ করিতেছে, স্বভাব উদ্ধত হইতেছে এবং নারীজীবনের বাধ্যতার অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। উদ্দাম শিক্ষার ফলে সংসারের কাহাকেও যেন তাহারা জানিতে চাহে না। ব্যক্তিত্ববাদের ঢেউ আসিয়া আমাদিগের চির শান্তিময় অন্তঃপুরকেও যেন বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। নবীনাগণ সংসারের প্রবীণাগণকে আর মানিতে চাহে না, বিবাহের পরই তাহারা যেন এক একটী গৃহিণী হইয়া পড়ে। কিন্তু সে গৃহিণীত্বের প্রসার আপনার বিলাস-কক্ষ পর্য্যন্ত, আপনার বেশ-ভূষাকে লইয়া, আপনার স্বার্থসিদ্ধি পর্য্যন্ত, সে গৃহিণীত্ব রন্ধনশালার ধার দিয়াও যায় না—রাঁধুনি বামুন রাখিতে হয়, পাছে নবীনা গৃহিণীর সোনার অঙ্গে কালী পড়ে, সোনার গহনা রন্ধনশালার ধূমে মলিন হইয়া যায়। এমন গৃহিণী আজকাল বঙ্গসংসারের ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন গৃহিণীর আর সে অন্নপূর্ণার ভাব নাই—এখন বাঙ্গালীর সংসারের অন্নপূর্ণা হইয়াছেন—অজ্ঞাতকুলশীল সম্পূর্ণ অপরিচিত উড়িয়া পাচক ঠাকুর! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! বঙ্গরমণীর গৃহকর্ম্মে এমন শৈথিল্য কোথা হইতে আসিল? একমাত্র পাশ্চাত্য বিলাস শিক্ষাই কি তাহার কারণ নহে? আজকাল অনেক নব্যশিক্ষিতা উল বুনিবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু যাহাতে প্রকৃত সংসারের উপকার হয়, তাহার দিকে নজর নাই। পূর্ব্বে মেয়েরা ছেঁড়া কাপড়গুলি সঞ্চিত করিয়া কন্থা প্রস্তুত করিতেন, পুরাতন পরিত্যক্ত কাপড় হইতে সুতা বাহির করিতেন এবং তদ্দ্বারা এমন কন্থা প্রস্তুত করিতেন যে শাল কোথায় লাগে? কিন্তু এখন হইয়াছে, পুরাতন কাপড়গুলির বদলে বিদেশ-জাত এনামেলের বাসন ক্রয় করা। অথচ নবীনাগণের উল বুনিবার সখ বড় কম নহে। যাহাতে উপকার হয়, তাহার দিকে নবীনারা বীতরাগ, কিন্তু যদ্দ্বারা বিলাস বৃদ্ধি পায়, তাহার দিকে তাহাদের ততোধিক চেষ্টা। আজকাল শাঁখার পাট ত উঠিয়াই যাইতেছে, এখন তাহার স্থান বিদেশী কেলোয়াডী চুড়ী

অধিকার করিয়াছে। মধ্যবিত্ত-সংসারে এ রোগটা বেজায় দেখা দিয়াছে। আমাদিগের নবীনারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সব দিকে বেশ চতুর হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু গৃহ-কর্ম্মের বেলা এবং রন্ধন-কার্য্যে সে চতুরতা যেন ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এখন বিদ্যা-লয়ের পরীক্ষা দেওয়াই নারী-জীবনের শিক্ষার চরম সীমা হইয়া উঠিয়াছে, গৃহকর্ম্ম শিখিবার সুযোগ আর তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। যে গার্হস্থ্য-শিক্ষা রমণী-জীবনের অতি আবশ্য-কীয় বস্তু, যাহার জন্য সমাজে নারীর স্থান এবং মান, সেই পবিত্র কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীনতা একালের নবীনাদিগের পক্ষে আদৌ গৌরব-জনক নহে। যে রমণী গৃহকর্ম্ম হেয়জ্ঞান করে, তাহার তুল্য অশিক্ষিতা সংসারে আর কে আছে? সে নারীকে আমরা নারী বলিয়া ধরিতে নারাজ। সে নারী সংসারে নিতান্ত আগাছা হইয়া জন্মিয়াছে। এক গৃহকর্ম্মে উদাসীনতা হেতু তাহার আর সকল শিক্ষা পণ্ড হইয়া গিয়াছে। এমন নারী যে সংসারে প্রবেশ করে, সেই সংসারের মঙ্গল আশা সুদূর পরাহত।

তাহার পর বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিক্ষার আর একটী ফল হইতেছে—নারীজাতির স্বাস্থ্যহানি। সে কালের মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা এত ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদিগের জীবনে পরিশ্রম-ক্ষমতা, সুদক্ষতা, শরীর ও মনের পবিত্রতা ও গৃহিণী-জনোচিত কোন গুণেরই অভাব ছিল না। এখন নারীগণ মনে মনে অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন হইয়াছেন বটে কিন্তু দৈহিক দুর্ব্বলতা, অসহিষ্ণুতা ও অসংযম ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে তাহারা কুড়ি না উত্তীর্ণা হইতেই বুড়ী হইয়া পড়িতেছে এবং বালিকাবয়স হইতেই ইচড়ে পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। নারীদের আর একটী মহৎ রোগ দেখা দিয়াছে—তাহা হিষ্টি-রিয়া। এমন ঘর আজকাল খুঁজিয়া পাইবে না, যেখানে ম্যালেরিয়ার ন্যায় হিষ্টিরিয়া নাই। বলা বাহুল্য এই রোগটীও এক সভ্যতার নূতন সৃষ্টি। যেখানে যত বেশী সভ্যতা এবং শিক্ষা, হিষ্টিরিয়া ততোধিক তথায় প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে। আর একটী রোগ সন্তান প্রসবে অক্ষমতা। একমাত্র আলস্যই তাহার প্রধান কারণ। আজকাল সন্তান প্রসব যেন একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, ধাত্রীর সাহায্য ব্যতীত মাতা আজকাল সন্তান প্রসব করিতে পারেন না। ইহাও এই পাশ্চাত্য বিলাসিতার ফল। বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে আলস্য আসা অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগের নবীনাগণের মধ্যে যাহারা আবার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছেন, পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে-ছেন, তাহাদিগের আভ্যন্তরিক রোগ ক্রমশঃই উৎকট হইয়া পড়িতেছে। সে রোগ ধরা যায় না বলিয়াই তাহার আরোগ্যের আশা অল্প।

তাহার পর বাঙ্গালীর সংসারে একটী বিষম ব্যাধি দেখা দিয়াছে—তাহা গৃহবিচ্ছেদ। যতই আমাদিগের কি পুরুষ কি নারীজাতির ভিতর ব্যক্তিত্ব জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই আমা-দিগের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। আজকাল এমন একটী ঘর খুঁজিয়া পাইবে না যেখানে নিরুপদ্রবে সংসার-যাত্রা

নির্ব্বাহ হইতেছে এবং সেই অশান্তির মূলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমাদিগের নব্য শিক্ষিতাগণের কোন না কোন প্ররোচনা বিদ্য-মান। ব্যক্তিত্ববাদের সঙ্গে স্বার্থপরতা না আসিয়া থাকিতে পারে না। যুবতী বিবাহের ও উচ্চ শিক্ষার ফলে গৃহস্থালীর অপেক্ষা আত্ম-সুখের দিকেই বঙ্গ-রমণীগণ আজকাল অধিকতর মনোযোগিনী হইয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি এই বিলাসশিক্ষাই যে আমাদের বঙ্গ-সংসারের কাল হইল—চারিদিক হইতে—ঘরে বাহিরে বিলাস বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ অভাবের সমাধান হইতেছে না। এই শিক্ষায় আমাদিগের বাবুগিরি ও আলস্যই প্রধান হইতেছে কিন্তু যাহা শিখিলে সংসারের সুখসাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, সে দিকে আমাদিগের নবীনা নারীজাতি যেন শিথিলভাবাপন্না হইয়া পড়িতেছে।

আর বাড়িয়াছে—অত্যধিক পোষাক পরি-চ্ছদ। অগ্রে বঙ্গরমণীরা গহনা পাইলেই সন্তুষ্টা হইতেন এবং সেই সব অলঙ্কারাদি অসময়ে কত কাজে লাগিত। এখন গহনার অপেক্ষা উত্তম বেশ-বিন্যাসের দিকে নবীনাগণের অধিকতর লক্ষ্য পড়িয়াছে। ইহাও ঐ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার কুফল। নবীনাগণের মধ্য হইতে যেন সরলতা ও সৌজন্য একেবারে উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থলে অধিকার করিয়া বসিয়াছে ছলা-কলা-চপলতা প্রভৃতি নির্লজ্জ পাশ্চাত্য নারীজনোচিত ব্যবহার। বঙ্গসংসার হইতে লক্ষ্মী যেন ক্রমশঃই বিদায় লইতেছেন, অন্ন-পূর্ণাও অন্তর্ধান করিতেছেন এবং তাহাদিগের স্থান আজ মুখরা সরস্বতীতে জুড়িয়া বসিয়াছে। বঙ্গের ঘরে ঘরে আজ নৃত্যগীত রাগই শুনিতে পাইতেছি, লক্ষ্মীর কৌটা, অন্নপূর্ণার ঝাপি আর দেখিতে পাইতেছি না। এখন বাণী ও বীণাতেই বঙ্গ ভরপুর, ধন-ধান্যে আর বঙ্গভূমির শ্যামল অঞ্চল পূর্ণ হইতেছে না, শঙ্খ-কঙ্কন ধ্বনিও আর শুনা যাইতেছে না। সরস্বতী এইবার বীণা হস্তে ভিক্ষায় বহির্গত হইবেন, তাহারই যেন সূচনা দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দুষ্টা সরস্বতী আমাদিগের নবীনাগণকে ক্রমশঃই যেন পাইয়া বসিতেছে!

ক্রমশঃ— শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

কর্ম্ম সাধনা।

মানুষের দুটি জন্ম হয়। প্রথম জন্ম অতি সাধারণ জন্ম—কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি পিণ্ড মাত্র, কেবল ভাব অনুভাবের পুত্তলিকা মাত্র, কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎকম্প এবং রক্ত-সঞ্চা-লনের একটি যন্ত্র মাত্র। ইহার পরে মানুষের আর একটি জন্ম হয়। এই জন্মে সে দেবতা হইবে, কি রাক্ষস হইবে, সাধক হইবে কি নাশক হইবে তাহা বুঝা যায়। এই জন্মেরই নাম সংস্কারের জন্ম। এই জন্মই যথার্থ জন্ম। এই জন্মের পর হইতেই মানুষ কর্ম্ম করিবার অধি-কারী হয়। এই জন্মের পর হইতেই মানুষ আপনাপন সংস্কার-ভেদে জগতের কল্যাণকামী সন্ন্যাসী বা সংসার-ধর্ম্মনিষ্ঠ সংসারী। এই দুইয়ের বাহিরে যাহারা, তাহারা হয় পিশাচ, না হয় রাক্ষস।

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই আমরা আনন্দ করি কিন্তু সে আনন্দ করিবার যথার্থ কোনও কারণ নাই। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশা আমাদিগকে নাচায় এবং আমরাও আনন্দ করিয়া থাকি।

যদি যথার্থ আনন্দ করিবার কোনও দিন থাকে, তাহা হইলে তাহা কেবল সেই দিন যখন বালক মানুষ হয়, যখন তাহার দ্বিতীয় জন্ম হয়, যখন বুঝিতে পারি সে সংসার-তরণীতে উঠিবার যোগ্য হইয়াছে, যখন বুঝিতে পারি তাহার পারের কড়ির যোগাড় হইয়াছে। জীবন ত কেবল সংসার-সৈকতে বসিয়া সুখের হাওয়া সেবন করা এবং সৌন্দর্য্যদর্শন করা নহে; জীবনত হইল—ঝড় তুফানকে অতিক্রম করিয়া পরপারে পৌঁছান।

জগতের ইতিহাস উপরের কথারই সাক্ষ্য দেয়। সমস্ত জগতের উন্নতির ইতিহাসে এই কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে—মানুষ কেবল খাইয়া পরিয়া, কেবল আপনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াই মানুষ হয় না। যে আপনাকে বিলাইতে পারে, ছড়াইতে পারে, সেই আপনাকে পায়, তাহারই আত্মার নিদ্রাভঙ্গ হয়,সেই জীবনের উচ্চ জীবনের আশার অরুণ-রাগ দর্শন করে এবং নূতন জীবনের সহস্র নূতন কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য উদ্যত হয়। তীরে বসিয়া যে ঢেলা গণে, তাহার ভাগ্যে কখনও রত্নলাভ হয় না। জীবনকে পাকা করিবার জন্য,কার্য্যক্ষম করিবার জন্য, বিপদের ডাক আমরা সদাসর্ব্বদা শুনিতে পাই, কিন্তু সে সকল ডাক আমরা প্রায়ই শুনিতে চাহি না। এটা যদি বুঝিতাম যে বিপদের আহ্বানের সহিতই বিপদের দানও আছে এবং পরিশেষে মানও আছে, তাহা হইলে এই যে আলস্যের দানবটা আমাদের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাকে তাড়াইতে পারিতাম।

আমাদের একটা কথা বুঝা উচিত যে, আমাদের নাই বলিয়াই আমাদের আশা করিবার অধিকার খুব বেশী। কিন্তু আশা করা যে খুব একটা সহজ কায তা নয়; ছেঁড়া চেটায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখাই আশা নয়, ছেঁড়া চেটাটাকে সরাইয়া ফেলিয়া সেখানে সোনার পালঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে সকল ঝক্কি পোহাইতে হয়, সেই সকল ঝক্কি পোহানই হইল ঠিক আশা করা। জগতের ইতিহাসের পাতা খুলিয়া দেখ, এই ভারতের অতীত ইতিবৃত্তের একটু আধটু পর্দ্দা সরাইয়া উঁকি মারিয়া দেখ, দেখিবে কেহই হাঁ করিয়া রাজা উজির মারিয়া বড় জাত কিম্বা বড়লোক হয় নাই। দাবা খেলিয়া কেহ কখনও বড় একটা যোদ্ধা হয় নাই। কঠিন সত্যের সঙ্গে যুঝিয়া, ঢাল তলোয়ারের বোঝা বহিয়া, শ্রম স্বীকার করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া এবং বিপদের বজ্রকে তুচ্ছ করিয়া, তবে লোকে বীর হয়। কর্ম্ম-সাধনাও সেই প্রকার একটি আদর্শের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আত্ম-বলিদান দিতে হয়, তবেই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনুষ্যত্ব লাভ হয়।

জীবনের প্রথমটা শুধু খেলা, শুধু কোলাহল, শুধু হাসি এবং ক্রন্দন। কিন্তু ইহার মধ্যেই সংযম প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে মানুষ গড়িয়া তুলিতে হয়। ক্ষুদ্র জীবনের

মধ্যেইত একটা বিরাট্ জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে—সেই জন্যইত বালকের জন্য এত শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহাকে দ্বিতীয় জন্মদান করিবার জন্য এত প্রচেষ্টা। যে বালক শৈশব-কালে চলিতে যাইলেই পড়িয়া যায়, সেই বালকইত উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে দেশ শাসন করে,—সেইত ইতিহাসের ধারা, মানব চিন্তার ধারা, পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়।

মানব-মন বড় সুকুমার বস্তু, কিন্তু ইহাই সংযত এবং সুদৃঢ় হইলে ঝঞ্ঝা, বজ্র, এবং জল-প্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক সকল শক্তিকে জয় করিতে পারে। মানবমন স্বর্গ মর্ত্ত সমস্তই জয় করিবার অধিকারী।

এই জন্যইত জগতের বৈজ্ঞানিক মানব, জগতের জ্যোতির্ব্বিদ মানব, জগতের কবিরাজ মানব এবং জগতের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এবং সমাজ-প্রবর্ত্তকও মানব। স্বর্গ এবং মর্ত্ত দুইই মানবের হাতের মুঠার ভিতর। এই হাতের মুঠাটাকে যে শক্ত করিতে পারে এবং ইহার প্রসার বাড়াইতে পারে তাহার শক্তিইত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। জগৎ এই সত্যকে লুকা-ইয়া রাখিতে চাহে না, নূতন নূতন ইতিহাস গড়িয়া, নূতন নূতন ঘটনা ঘটাইয়া এই সত্যকে সূর্য্যালোকের ন্যায় দেখাইয়া দেয়—যাহার চক্ষু আছে সে দেখে—যে অন্ধ সে আবার কি দেখিবে? কিন্তু এই সত্যদর্শন-লাভই যথেষ্ট নহে; এই সত্যলাভ করাই হইল প্রকৃত লাভ। এই সত্যলাভ করিতে হইলে খাটিতে হয়, সুখ-লালসা বিসর্জ্জন করিতে হয়, জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিতে হয়। জগতের ইতিহাসের বর্ত্তমান সময়ে যে সকল পত্র উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে এই কথাই দীপ্ত রহিয়াছে। ইতিহাস পাঠক ঘটনার মধ্য দিয়া সত্য পাঠ করেন, ঘটনাবলীর জালে জড়িত হয়েন না।

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হতাশ-চিতে।

(১)

অয়ি চিন্তে! স্থির নেত্রা প্রশান্ত আননা,
মনোহরা অচঞ্চলা তাপসী নবীনা।
তব পাশে অভাগার
আছে কি গো বলিবার,
তুমিই ঘুচাবে মম মরমের ব্যথা,
জানি তুমি এ অধমে চির অনুগতা।

(২)

পড়ে মনে আশার সে ঘোর প্রলোভন,
খুলে ছিল চিত্র কত নয়ন রঞ্জন।
দেখেছিনু কি সুন্দর
শোভাময় এ সংসার
অধিষ্ঠিতা আছে তাহে শান্তি বিধায়িনী,—
অমর বাঞ্ছিতা এক নবীনা সঙ্গিনী!

(৩)

পলক ফেলিতে হায় কি পরিবর্ত্তন,
ভেঙ্গে গেল কৌমারের সোনার স্বপন।
কোথায় সে চারু শশী
গৌরব বিভব রাশি;
সহসা লুকায়ে গেল কোথা মায়াবিনী,
আরত হেরি না তথা কল্পনা রঙ্গিণী!

(৪)

নিয়তির প্রকম্পনে নবীন যৌবনে,
উপনীত এবে আমি জীবন-শ্মশানে।
সঞ্চিত বাসনা রাজি,
ভস্মীভূত হ'ল আজি ;
বিদ্রূপের অট্টহাসি রোধিছে শ্রবণ,
নৈরাশ্য-তটিনী মম সম্মুখে ভীষণ।

(৫)

কে জানিত ধরা এত প্রতারণাময়,
ছায়াবাজী পূর্ণ ঘোর মরু-ভূমি প্রায় !
এই রম্য সরোবর
ক্ষণে হয় ভয়ঙ্কর,
এই চন্দ্রালোক-ভরে হাসিছে যামিনী,
এই ঘন গরজনে কম্পিতা মেদিনী।

(৬)

এস চিন্তা প্রিয়তমে মানস-ঈশ্বরী,
সুখে দুঃখে তুমি মম চির সহচরী !
বিশুষ্ক কুসুমদলে
সমর্পি তোমার গলে ;
তোমার আমার মনে করিয়া মিলিত,
শ্মশান বাসর ঘরে হোক্ পরিণত !

(৭)

বিশ্ব-তটে মহা-শূন্যে দিগন্তের পর,
চল সখি দিব্য গতি প্রভাবে তোমার—
হেরি সৃষ্টি স্থিতিলয়,
নিয়ন্তার ক্রীড়াচয়।
বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ পার্থক্য হারায়ে,
অতীতের সনে থাক্ ধরায় মিলায়ে।

(৮)

কৌশিক অঞ্চল তব করি প্রসারিত,
ঢেকে দাও অভাগার বদন লাঞ্ছিত।
বক্ষে বক্ষ করে কর
মিলে যাই পরস্পর ;
সুতীব্র মদিরা পূর্ণ চুম্বনে তোমার,
ধরায় বিলুপ্ত হোক্ চেতনা আমার !

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

দেবপুর-ইতিহাস।

চাপগড় রাজবংশ।

(১)

চাপগড় রাজবংশের আদি পুরুষ দেবাদিদেব মহাদেবের পরম-ভক্ত "নন্দিরুদ্র" হইতে সমুৎপন্ন। নন্দিবংশের বিখ্যাত কিংবদন্তি এই যে,—পরশুরাম ধরাকে ক্ষত্রিয়হীন করিবার কালে সঙ্কোচ ক্ষত্রিয়গণ ; (১) হিমালয়ের নিম্ন-দেশে জঙ্গলে লুক্কায়িত ছিলেন।

সেই বিজনবাসী ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের "বীরপাগিলী" (২) নামধেয় অবিবাহিতা এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যা উক্ত জঙ্গলের সন্নিহিত দীর্ঘিকায়, প্রতিদিন স্নান ও তর্পণাদি করিয়া শিবারাধনা করিত। কন্যার ভক্তিতে ভক্তাধীন আশুতোষ আশু সন্তোষ হইয়া তদীয়ানুচর নন্দীকে, সেই কন্যার নিকট প্রেরণ করেন।

(১) "পরশুরাম ভয়াৎ ক্ষেত্রি-সঙ্কোচ কোচ ইত্যাদি।"
(মনুসংহিতা)

(২) "বীরপাগিলী" একখানি পৌরাণিক হস্তলিখিত কাব্য পুস্তক। ইহাতে এই বৃত্তান্ত বিবৃতরূপে লিখিত আছে। এই কাব্যখানি অধুনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

শিবভক্তনন্দী শিবাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া, কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় পরিচয় এবং আগমন বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। কন্যা শিবভক্ত নন্দীর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকেই স্বামীরূপে পাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। নন্দীও তাহাতে অসম্মতি প্রদান না করিয়া ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বীর-পাগলী নন্দীর কৃপায় একটী অসাধারণ রূপ-লাবণ্যা-যুক্ত পুত্রলাভ করিল।

কিন্তু লোক-লজ্জাভয়ে কুমারী ঐ সুকুমারটিকে সরোবর জলে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যতা হওয়ায়, হর-গৌরী নন্দীসহ তথায় উপনীত হইয়া ঐরূপ কর্ম্মে বাধা প্রদান করেন। বীর-পাগলীকে এইরূপ পাপকার্য্য সাধনে প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া মহাদেব কহিলেন—হে দেবি! এক সময় একাম্র-কাননে রেবতীদেবী আমার এইরূপ প্রীতিভাজনা হইয়াছিল। পরন্তু আমি স্বাংশে অবতার পরিগ্রহ করতঃ তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কলিকালে সেই বংশধরগণ "শিববংশ" আখ্যায় প্রাপ্ত হইয়া (১) পৃথিবীতে স্বাধিকার স্থাপন করিবে। অতএব হে কুমারী! তোমার এই শিশুকুমারও "নন্দী-অংশাবতার। সুতরাং ইহার বংশ পরম্পরা "নন্দীবংশ" নামে এই স্থানে বিপুল সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। আর আমাদের আশীর্ব্বাদে অদ্য হইতে তোমার এই সিদ্ধস্থান সরোবরটি তোমারই নামে অভিহিত হইবে।

হে সতি! যে ব্যক্তি এই সিদ্ধি-সরোবর জলে স্নান করিয়া ভক্তিভরে পূজা করিবে, আমাদের বরে সেই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া, অন্তে অনন্ত কৈবল্যধাম শিবলোকে আশ্রয় পাইবার অধিকার পাইবে।

অতএব হে কুমারি! অদ্য হইতে তোমার পুত্রের নাম "বীরুপাক্ষ" রক্ষা করিবে। হর-গৌরী এইরূপ কহিয়া, নন্দীসহ কৈলাসে প্রস্থান করিলে কুমারী পুত্রের নাম "বীরুপাক্ষধর" রক্ষা করিলেন। (১)

ক্ষাত্রকুমারী বীর-পাগিলী। বীরুপাক্ষধর পুত্রটিকে দীর্ঘিকার পার্শ্বে পর্ণাশ্রমে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর একদা বীরপাগলী শিবপূজার নিমিত্ত, বিল্বপত্রাদি চয়ন করিয়া দীর্ঘিকার তীরে শিব-লিঙ্গ অর্চ্চনা করিলেন এবং তর্পণ মানসে জলে নামিয়া ডুব দিলেন। কিন্তু চির-দিনের জন্য আর কূলে উঠিলেন না। অদ্যাবধি ঐ দীর্ঘিকাকে জনসাধারণে "বীর-পাগিলীর দীঘি" বলিয়া থাকে এবং নানা স্থান হইতে বহু নর-নারী আসিয়া ইহাতে স্নান তর্পণাদি করতঃ পবিত্র হইয়া থাকেন।

অনেক বন্ধ্যা স্ত্রীলোক সন্তান কামনায় এ স্থানে বিল্বদলে শিব-লিঙ্গ পূজা করেন। প্রতি বৎসর শিব-চতুর্দ্দশী তিথিতে এখানে বৃহৎ "মেলা" বসিয়া থাকে। এই মেলায় নানাবিধ পার্ব্বত্য পণ্যদ্রব্য আমদানী হয়। বিদেশী ধনী মহাজনেরা কাংশপাত্র, লবণ, চিনি ইত্যাদি বিনিময়ে পর্ব্বতজাত গন্ধরাজ, কালকুটবিষ, মৃগ-মদ, কম্বল, কার্পাস, কমলা, কবলীচামর, এবং মেষ-লোম প্রভৃতি গ্রহণ করেন।

(১) কুচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশ খ্যাতি।

(১) দেবাদেশ ধারণ জন্ত এই বংশধরগণ নামের পরে "ধর" উপাধী সংযোগ করিয়া থাকেন।

বীর-পাগিলী কুমারীর গর্ভজাত সন্তান হইতে নন্দীবংশের (১) অবতারণা হয়। অধুনা সেই বংশধরগণ চাপগড়ের রাজবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।

প্রাচীন সময় কামরূপ-কামাখ্যা বা প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর, কাম-পীঠ, সুবর্ণ-পীঠ, রত্ন-পীঠ, সৌমার বা চুমার-পীঠ প্রভৃতি পবিত্র পীঠ দ্বারা বিভক্ত ছিল। পরন্তু ঐ পীঠগুলি একণে শিবগড়, দিব্রুগড় বা দেবগড়, ইন্দ্রগড়, ভীতরগড় এবং চাপগড় প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত হইতেছে। আমাদের প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য এই,—রত্নপীঠের পশ্চিম সরহদ্দে ভিতরগড় এবং চুমার পীঠের পশ্চিম সীমায় চাপগড়ের রাজবংশ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করা। সুপবিত্র রত্নপীঠান্তর্গত ভিতরগড়ের মহারাজ জল্পেশ্বর বর্ম্মনের রাজ্যচ্যুতি ঘটিলে, কতকদিন তাহাতে ভুটিয়ারাজ স্বাধিকার স্থাপন করেন। তারপর সদাশয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, উহা কুচবিহার রাজবংশের রায়কত বংশধরগণের অধিকার ভুক্ত হয়। ভিতরগড় এবং রায়কত-বংশের কথা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। শেষোক্ত চুমার পীঠ প্রাচীন সময় চাপগড় রাজার করায়ত্ব ছিল। পরে উহা ভুটিয়া-রাজ অধিকার করিয়া লয়েন। বর্ত্তমানে ভুটিয়া-রাজকে যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া, গবর্ণমেণ্ট উহা আপন অধিকারে রাখিয়াছেন। একণে উল্লিখিত উভয় গড়ের মৃত্তিকা জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। স্রীতানদের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে চাপগড় রাজ্য, অধুনা দ্বিভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বপার ময়নাগুড়ী ধুপগুড়ী (জল্পেশ্বর শিব মন্দির) পশ্চিমপার তেতুলিয়া জলপাইগুড়ী)।

পৌণ্ড্র রাজ-বংশীয় মহারাজ জল্পেশ্বর বর্ম্মনের অলৌকিক জীবন-প্রদীপ নির্ব্বানের কিছুদিন পরে, চাপগড়ের বীর-পাগিলীজাত বীরুপাক্ষ-ধরের সন্তান সন্ততিগণ চাপগড়ে স্বাধিকার স্থাপন পূর্ব্বক দিগ্বিদিক্ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এই বংশধরগণ চিরকালই ভূটিয়া রাজার সহিত বন্ধুভাবাপন্ন থাকায়, চাপগড় রাজ্যের করস্বরূপ বার্ষিক মেষ, ছাগ, কার্পাস প্রভৃতি যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন, এইজন্য ভূটিয়াধিপতি তাঁহাদের "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। গুড়ী ও লক্ষণকাট্‌মা, নামক দুই ব্যক্তি ভূটিয়ারাজাকে রাজ্যের রাজস্ব সংগৃহীত করিয়া দিতেন। ইহারা উভয়েই ভোটরাজের করাদায় বিভাগীয় তহশীলদার ছিলেন।

অধুনা সেই নন্দীবংশধর, নিম্ন-পুরুষে পঞ্চদশ সংখ্যক পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাদের বংশের নবমপুরুষ বজ্রধর মহারাজ যখন রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই সময় পার্ব্বত্যরাজার প্রাগুক্ত লক্ষণ কাট্‌মা প্রভৃতি কতিপয় রাজকর্ম্মচারী প্রবঞ্চনা করিয়া ভোট-রাজার সহিত মহারাজ বজ্রধরের এক তুমুল সংগ্রাম বাঁধাইয়া দেন। এই সমর সংঘর্ষনের মূল কারণ কিছুই নাই। তবে উদ্দেশ্য এই—লক্ষণ-কাট্‌মা চাপগড় রাজকর মৎস্বরূপ করিয়া,ভোট-রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "বজ্রধর স্বয়ং একণে চাপগড় ভূস্বামী।" তজ্জন্য রাজার প্রাপ্য তিনি বন্ধ করিয়াছেন, যুদ্ধই তাঁহার অনিবার্য্য।" ইত্যাদি ইত্যাদি। দূতমুখে এইরূপ সংবাদ

(১) নন্দি বা কার্কী বংশ।

পাইয়া এবং তাহার মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে, তাহা বিচার না করিয়া ভোটরাজ বজ্রধরকে ধৃতোদ্দেশ্যে একদল ভূটিয়া সৈন্য প্রেরিত করিবার অনুজ্ঞা করিলেন।

এইরূপ ষড়যন্ত্র এবং চতুরালী প্রকাশ করিতে না পারিলে, চাপাধিপতিকে ধৃত করা সহজ সাধ্য হইবে না, সুতরাং ভোটমন্ত্রীর সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া বজ্রধর রাজার অভ্যোতসারে রজনী-যোগে একদল সৈন্য লইয়া লক্ষ্মণ কাট্‌মা চাপগড়ে উপস্থিত হইলেন। ভূটিয়া সৈন্য যখন রাজবাটীর সদর ফটকে উপস্থিত হইলেন; তখন প্রহরিগণ নিদ্রার সুকোমল বক্ষে শান্তি ভোগ করিতেছে। অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। অন্দরমহলে "বুঁচি" নাম্নি একজন সহচরী কেবল মাত্র রাজ-মহিষীর অঙ্গ সেবায় স্বচেতনা ছিল। ভূটিয়া সৈন্য এই অবসরে নিঃশব্দে নিদ্রিতা প্রহরীবর্গকে কাটিতে লাগিল। জনৈক প্রহরী আক্রমণের বিষয় জানিতে পারিয়া কোন প্রকারে তাহাদের হস্ত হইতে পলাইয়া, অন্দরমহলে রাজাকে এই সংবাদ প্রদান করিল।

ভোটসৈন্যের সঙ্কেত "ভোটশিটি (১) সর্ব্বপ্রথম বুঁচী সহচরীর শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। সঙ্কেত ধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই বুঁচী রাজমহিষীকে ডাকিলেন এবং মহারাজকে তাহা অবগত করাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। মহারাজ চৈতন্যলাভে বুঁচীরহস্তরক্ষিত সজ্জিত তামাক-কল্কি আলবলায় স্থাপিত করিয়া, চুম্বন করিতে করিতে চক্ষুরুন্মিলন পূর্ব্বক বুঁচীকে বলিলেন—"বুঁচী! রাত্রি কি প্রভাত হইয়াছে?"

এই সময় অকস্মাৎ কপাটে ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। বুঁচী রাজাজ্ঞা লইয়া তাড়াতাড়ি অর্গল মুক্ত করিয়া দিলেন। দেওয়ানদেবকে সঙ্গে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সর্দ্দার জয়সিংহ রাজসমীপে উপনীত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সেই নিদারুণ দুর্দ্ধর্ষ সংবাদ করযোড়ে জ্ঞাপন করিলেন। দেওয়ানদেব মহারাজকে অনতিবিলম্বে রাজবাড়ী স্থানান্তরে লইয়া যাইবার অনুরোধ জানাইয়া, বিপক্ষ দলকে বাধা প্রদানের নিমিত্ত জয়সিংহকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তচ্ছ্রবণে রাজা ও রাজমহিষী নিতান্ত সঙ্কোচ সহকারে কন্যাটি সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে পশ্চাৎদ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। এই বিপদের সময় তাঁহাদের অনুগামিনী হইল —একমাত্র বুঁচী।

ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী। আকাশ-মণ্ডল নবীন মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন। অতি গাঢ় অন্ধকার। তাহাতে আবার হিমালয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া সন্ সন্ শব্দে সমীরণ, তুষার রাশিকে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করিতেছে। বাত্যাপ্রবল সময় কদলীরুহে পত্রগুলি যেমন থর্ থর্ কম্পন করিয়া থাকে, মহারাজ বজ্রধরও তদ্রূপ নিদারুণ শীতে অধর ওষ্ঠ কাঁপাইয়া, পরিবারবর্গ সহ অসংখ্যারণ্য বিদীর্ণ করিয়া, তীস্তানদের কূলে [illegible] ছিল। মহারাজ তাহাতে [illegible]

(১) জীহ্বাগ্র করাঙ্গুল দ্বারা তালব্যে ধরিয়া ফুৎকার করিলে অত্যাচ্চ কণ্ঠস্বর নিঃসরণ হয়। ভোটেরা বিপদ বিষয় সঙ্কেতকালে এইরূপ শিটি-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। এবং তরণী ছাড়িয়া দিলেন।

চাপগড়াধিপতি তরণী বাহিয়া জলপাইগুড়ী অভিমুখে যাইতেছেন, লক্ষ্মণ কাট্‌মা তাহা জানিতে পারিয়া সৈন্যসহ তাঁহাদের পশ্চাদানুসরণ করিতে লাগিল। সে সময় রাজতরণী বহু দূরে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি পশ্চাতে সৈন্যের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উর্দ্ধশ্বাসে সৈন্যগণ ছুটিয়া আসিতেছে। এতৎ অবলোকনে রাজা, রাণী বুঁচীর পৃষ্ঠে কন্যা কমতেশ্বরীকে আরোহণ করাইয়া নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কূলে উঠিলেন। এই সময় সৈন্যগণ বিপরীত দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কোন উপায়ন্তর না দেখিয়া মহারাজ সাহসে বুক বাঁধিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। বুঁচী মহারাণীর অঞ্চল টানিয়া মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া মহারাজ বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। অদূরে জলপাইগুড়ী। দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে পারিলে, মহারাজ পরিবার সহ ভুটান সরহদ্দ পার হইয়া জলপাইগুড়ী পঁহুছিতে পারেন। এমন সময় রজনী প্রভাত হইল। রাজা তখন বড়ই ভগ্নমনা হইয়া পড়িলেন এবং নিরুপায় হইয়া স্বকীয় পরিজনবর্গের সহিত প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময় সদাশয় পরমপিতা পরমেশ্বরের অপার কৃপার একটী চিহ্ন দেখা দিল। রাজা জঙ্গলের অনতিদূরে খুট্‌ খাট্‌ শব্দ এবং জনরব শুনিতে পাইলেন। শব্দানুসরণে মহারাজ তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, দীর্ঘকায়া কৃষ্ণাঙ্গী, বিকটদশনা, দীর্ঘনাশা, জবাবর্ণাক্ষী একটি স্ত্রীলোক কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। তখন রাজা সেই স্ত্রীলোকটির নিকট আত্মপরিচয় এবং শঙ্কটাবস্থার কথা সমস্তই জানাইয়া উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই কাঠুরিয়া স্ত্রী, চাপগড়ের মহারাজের আত্ম-পরিচয় পাইয়া, এবং তাহার এই ভয়ানক বিপদ দেখিয়া বড়ই দুঃখিতা ও মর্ম্মাহতা হইল।

ইত্যবসরে ভুটিয়া সৈন্য ভীমবেগে আসিয়া পড়িল। ভুটিয়া রাজ্য ও জলপাইগুড়ীর সন্ধিস্থলে তাহারা কাতার দিয়া দাঁড়াইল। আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কোন উপায় না দেখিয়া মহারাজ সেই কাঠুরিয়া স্ত্রীর পরামর্শে কাষ্ঠের বোঝার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কাঠুরিয়া পত্নী কাষ্ঠের বোঝা মস্তকে বহিয়া সকলকেই একে একে ভুটান সরহদ্দ অতিক্রম করাইয়া ভিন্ন রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিল। ক্রমশঃ—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা সরকার।

রাজা নীলাম্বর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পথিমধ্যে।

বেলা অবসান সময়ে একজন অশ্বারোহী ঘোড়াঘাট রাস্তা অবলম্বনে অতি দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। বর্ষাকাল, অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছে, রাস্তা কর্দ্দমময়, স্থানে স্থানে জল জমিয়া আছে, তাহাতে অশ্বের গতি রোধ হইতেছে। আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ, এক একবার সৌদামিনী দেখা দিয়া অদর্শন হইতেছে। আবার বজ্রগতীর নাদে

গর্জ্জন করিয়া লোকের ভীতি সঞ্চার করিতেছে। পথিক এক একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, আবার পথের দিকে চাহিতেছেন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইতে লাগিল। পথিক জানেন নিকটে আশ্রয় স্থান নাই, অতএব একটু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু উপায় নাই, দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচালনা করিয়া যতদূর যাইতে পারেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল,তথাপি অশ্বারোহী গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিলেন না। আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন,দেখিলেন—মেঘের সঞ্চার কমিল কিনা, কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত, অতএব চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে চলিতে লাগিলেন। এখন আর দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতে সাহস করিলেন না, রাস্তায় নানারূপ বিঘ্ন, হয়ত অশ্বসমেত ভূমিশায়ী হইতে পারেন, সেই জন্য অতি ধীরে ধীরে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। অন্ধকারে রাস্তায় আর কিছু দেখা যায় না, ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, বৃষ্টিও হইবে এইরূপ অনুভব হইল, তখন পথিক আশ্রয় অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইলেন। তিনি অশ্ব থামাইয়া চারি দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,কোন দিকে কিছু দেখিলেন না। এইবার তিনি রাস্তা ত্যাগ করিয়া মাঠ ধরিলেন এবং ধীরে ধীরে অশ্ব মাঠের মধ্য দিয়া চালাইলেন। অনেক দূর গিয়া তাঁহার বোধ হইল, একটী আলো মিট্ মিট্ করিয়া দূরে জ্বলিতেছে, ঐ আলো লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। যতই যান, ততই আলো দূরবর্ত্তী হইতেছে। অবশেষে বিরক্ত হইয়া অশ্বটি সেই ময়দানে ছাড়িয়া দিলেন, এবং পদব্রজে ঐ আলো অভিমুখে চলিলেন। অশ্ব সুশিক্ষিত, অশ্বারোহীর সঙ্কেত ধ্বনি শুনিলেই আসিবে, ইহা অশ্বারোহী বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি পদব্রজে প্রায় একক্রোশ রাস্তা গিয়া আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই সময়ে হটাৎ ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হইল, বৃষ্টিও সবেগে পতিত হইতে লাগিল, অশ্বারোহী দৌড়াইয়া গিয়া একটী চালা ঘরে আশ্রয় লইলেন। তিনি দেখিলেন—ঘরটি নির্জ্জন, অন্ধকার; ঐ ঘরের নিকটেই একটি ভগ্ন ইষ্টকালয়, তাহার ক্ষুদ্র ছিদ্র মধ্য হইতে আলো বাহির হইতেছে। বাটীর দ্বার রুদ্ধ, অতএব ভিতরে প্রবেশের উপায় ছিল না। পথিক ক্ষুধার্ত্ত, তিনি মনে করিলেন—যখন আলো জ্বলিতেছে, তখন নিশ্চয়ই কোন লোক ঐ স্থানে আছে, অতএব সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ঐ ইষ্টকালয়ের নিকট গেলেন। বিদেশে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, অতএব একেবারে দ্বারে করাঘাত না করিয়া, একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা ঘরের ভিতরের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন একজন কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায়া বৃদ্ধা একপার্শ্বে বসিয়া আছে, আর একজন বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে। তাঁহার বোধ হইল সেটি শবদেহ, মনুষ্য হইলে নিশ্চয়ই নড়া চড়া করিত। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। একা বৃদ্ধা গৃহমধ্যে আছে, অতএব কোন ভয়ের কারণ নাই, তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতর হইতে শব্দ হইল—"কে? হোসেন্ আলি?" পথিক উত্তর করিলেন না। দ্বার উন্মুক্ত হইল, পথিক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, তারপর

তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"বাবা! এখানে এ সময়ে কেন?" পথিক বলিলেন—"এই অন্ধকার রাত্রে আমি নিরাশ্রয়, তাই আশ্রয়ের জন্য এসেছি।" বৃদ্ধা একটু চিন্তিত হইল, তারপর বলিল—"তোমাকে দেখে হিন্দু ব'লে বোধ হচ্ছে, এই সিংহের গহ্বরে কেন এলে? বৃষ্টিঝড়ে মর্‌বে না, কিন্তু এখানে অর্দ্ধঘণ্টা থাক্‌লেই তোমার মৃত্যু।" অশ্বারোহী বলিলেন—"আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে।" বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল—"অস্ত্রে কি কর্‌বে? তুমি একা কয়েজনের সঙ্গে লড়াই কর্‌বে? এখনও সময় আছে, পালাও, নতুবা প্রাণ নিয়ে যেতে পার্‌বে না। আমি বৃদ্ধা, তোমার মায়ের মত—তোমাকে সদুপদেশ দিচ্ছি, এখনও পালাও।" পথিক ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে মনুষ্যের শব্দ শুনা গেল। বৃদ্ধা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ! তারা এসেছে, তুমি আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ঘরের কোণে লইয়া গেল এবং একটী ভগ্ন কাষ্ঠ-সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উপরকার ডালা বন্ধ করিয়া দিল। সিন্দুকের চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র, অতএব নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইল না। পথিক ভাবিলেন—হয়ত বৃদ্ধা তাহাকে ধরাইয়া দিয়া এরূপভাবে বধ করিবে। তিনি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, বাহিরে থাকিলে সহজে কেহ তাহাকে পরাভূত করিতে পারিত না, কিন্তু এখন যে কেহ অতি সহজে তাহাকে নিহত করিতে পারিবে। যাহা হউক, এক্ষণ আর উপায় নাই, যাহা ঈশ্বরেচ্ছা তাহাই সম্পাদিত হইবে, এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই কয়েক জন লোক গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধাকে একজন বলিল—"কি অবস্থা?" বৃদ্ধা শবদেহ দেখাইয়া দিল, তখন সকলে শবের চারি দিকে বসিল। একজন বলিল—"এত শীঘ্র মৃত্যু হ'ল?" বৃদ্ধা বলিল—সব খোদার ইচ্ছা, তোমার আমার হাত কি আছে।" হোসেন আলি বলিল—"মা! আমাদের এবারকার যাত্রাই ভাল নয়। কোন সুফল ফলে নাই।" বৃদ্ধা বড় বিপদে পতিত হইল, একজন অপরিচিত লোক সব কথা শুনিতে পাইবে ইহাও বড় কঠিন কথা। অথচ ইহাদিগকে কিছু বলিবারও উপায় নাই। বৃদ্ধা বলিল—"পরে ওসব কথা শুন্‌বো, এখন কিছু খাও, এই পরিশ্রম করে এলে।" তখন আর এক ব্যক্তি বলিল—"আহার ক'রে পরে যাহা হয় করা যাবে।" বৃদ্ধা আহার্য্য সামগ্রী বাহির করিয়া উহাদের সম্মুখে ধরিল, উহারা আগ্রহের সহিত উদরস্থ করিতে লাগিল।

পথিক দেখিতে পাইলেন ইহারা পাঁচজন লোক, সকলেই বলিষ্ঠ, সকলের নিকটেই এক একটি লম্বা অসি, এবং নিকটেই তীর ধনুক রক্ষিত। তিনি বুঝিলেন—ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষার উপায় নাই। তিনি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—ইহারা সকলেই মুসলমান। ইহারা কিসের জন্য এই নির্জ্জন স্থানে আড্ডা করিয়াছে, ইহা জানিতে অত্যন্ত কৌতুহল হইল। তবে ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, স্ত্রীলোকটি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবে না। তিনি স্ত্রীলোকটির নিকট মনে মনে কৃতজ্ঞ হইলেন।

উহারা আহারাদি সমাপন করিলে হোসেন আলি বলিল—"মা! এখন তুমি কি বল, আমরা কি করবো।" স্ত্রীলোকটী বলিল—"বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ, খোদা তাহা সহ্য করবেন না। এখনও সময় আছে, সাবধান হও।" আর একজন বলিল—"মা! আমরা ছয় ভাই ছিলেম, এখন একজন ত ম'রে গেল, পাঁচজন হ'লেম। তোমার আশীর্ব্বাদ আমরা সর্ব্বদা চাই। তুমি যা বলবে তাই করা কর্ত্তব্য। তবে এটা মনে রেখো যে হিন্দুরা কাফের, আমরা বাদশাহের জাত, বাদসাহের চাকর।" বৃদ্ধা বলিল—"বাবা" ঠিক বলেছ, তবে আমরা কার রাজ্যে বাস কচ্ছি সেটা ঠিক আছে ত? পুরুষানুক্রমে আমরা হিন্দুর নিমক্ খাই, এখন কি বিশ্বাসঘাতক হওয়া উচিত?" একজন বলিল—"মা! তবে কি আমরা বাদশাহের চাকরী ছেড়ে দিব? আমরা ত সেই টাকা দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছি। দেবদাস আমাদিগকে টাকা দিয়াছে, আমরা সেই মত কার্য্য করবো। তাহাতে খোদাও সন্তুষ্ট হবে, মনিবও সন্তুষ্ট হবে।" বৃদ্ধা বলিল—"তোদের যা ইচ্ছা কর্, কিন্তু জানবি খোদা তোদের মঙ্গল করবেন না।" ইহার পর আর কেহ কিছু কথা বলিল না, শবদেহ ও কোঁদালী লইয়া বাহির হইল। এই অবসরে বৃদ্ধা পথিককে বাহির করিয়া বলিল—"শীঘ্র পালাও, যা শুনেছ কাহারও নিকট প্রকাশ করো না, আমি অন্য কিছু তোমার নিকট চাই না। ঈশ্বর যে তোমাকে বাঁচিয়েছেন—এই মঙ্গল।" পথিক কিছু অর্থ বৃদ্ধাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এই কথার পর সে বিষয় আর উল্লেখ করিলেন না। তিনি বৃদ্ধার নিকট চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তারপর বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিছুদুর অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন অশ্বটি একস্থানে দাঁড়াইয়া আছে, তিনি এই অন্ধকার রাত্রে ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া পুনরায় সদর রাস্তার দিকে চলিলেন।

ক্রমশঃ— শ্রীঅমলানন্দ বসু।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন!

"আলোচনার ১৩২২ সালের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল, নানাপ্রকার প্রেসের গোলযোগে এবার পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে একটু বিলম্ব হইয়াছে, এইজন্য গ্রহকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আলোচনার উৎকর্ষ সাধন করিতে এবার হইতে আমরা কিছুমাত্র ত্রুটী করিব না। "আলোচনা" পত্রিকার এই সকল কার্য্য করিতে সমবেত শক্তির আবশ্যক, গ্রাহকগণের কৃপা-দৃষ্টি না পাইলে এ বিষয় কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। এইজন্য তাঁহাদের নিকট সানুনয়ে কৃপাভিক্ষা করিতেছি। আসুন, সকলে ইহার উন্নতি কল্পে আপনার বন্ধু-বান্ধকে গ্রাহক করিয়া দিন এবং বার্ষিক সাহায্য পাঠাইয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। এত অল্প মূল্যে এমন সারগর্ভ মাসিক পত্র আর নাই—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। অতঃপর আমরা সকলের নামে ক্রমশঃ ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাঠাইব, ইহার জন্য কাহার নিকট আর স্বতন্ত্র তাগিদপত্র পাঠান হইবে না। যাহাদের আপত্তি থাকে, সত্বর জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ম্যানেজার।



৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আলোচনা, ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২২ সাল।

কালী-তত্ত্ব।

দেবাদিদেব মহাদেব চিদাকাশ-স্বরূপে শান্ত প্রসন্নভাবে শয়ান। তদুপরি ভগবতী মহামায়া মনোময়ী স্পন্দনশক্তি—লোলজিহ্ব-বদনে, সুখ-প্রসন্ন আননে দণ্ডায়মানা। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম—উদাসীন, সুষুপ্ত, নির্ব্বিকার ও নিশ্চল; নিরাকার চৈতন্য প্রত্যক্ষে আইসে না, তাই শান্তং-শিব-সুন্দর রূপং। মনোময়ী ইচ্ছাই বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিতা—তাই বিশ্ব-প্রপঞ্চ প্রসবিত্রী, ভক্তজন কামনাপূর্ণকারিণী মূর্ত্তিমতী মাতা। এই মহামায়া ইচ্ছাশক্তি জগজ্জননী হর-প্রিয়াই আমাদের কালিকা মূর্ত্তি—বাঙ্গলীর ইষ্টদেবী।

চৈতন্য যখন স্বরূপে অবস্থিত, নিষ্ক্রিয়, তখন বিশ্ব-প্রপঞ্চ নাই, জগদ্বাসী নাই। যখন বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত, সক্রিয়, তখনই এই সচরাচর জগৎসত্ত্বা এবং বিশ্ববাসীর জন্ম, স্থিতি। এই বিশ্ব চৈতন্যের ব্যষ্টিভূতা ক্রিয়া। সমষ্টিভূতা ক্রিয়াই মূল প্রকৃতি—মহামায়া কালী।

চৈতন্যের চিতিশক্তি-রূপিণী ক্রিয়া যখন প্রতিকূল স্পন্দনাত্মক জড়রূপে অভিব্যক্ত হয়, তখনই ভগবতী বা কালী, তাঁহারই স্থূলতম বিকাশ—এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড। এই স্থূল পাঞ্চ-ভৌতিক জড়-বিশ্বই এই ভগবতী কালী বা স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়ার অঙ্গ। সপ্তদ্বীপা পৃথ্বীই শরীর—কাজেই পৃথিবীর কৃষ্ণবর্ণ ই কালিকার অঙ্গের বর্ণ। পৃথিবীর বর্ণ কৃষ্ণ—ইহা প্রাচ্য-বিজ্ঞান সম্মত। পৃথিবী শস্য-শ্যামলা—তাই কৃষ্ণা পৃথিবীর নাম—ইহা লোকপ্রসিদ্ধি।

আকাশ-স্বরূপা বলিয়াও কালী কৃষ্ণবর্ণা। যাহা প্রত্যক্ষের অতীত, তাহাই নীল বা কৃষ্ণ। আকাশ দৃষ্টি গোচরাতীত—তাই নীল। জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম প্রকৃতি, বিশ্বজন প্রসবিত্রী কালিকা কৃষ্ণবর্ণা বায়ু তাঁহার স্পন্দন, মণিও তাহার প্রভা, অগ্নিও তাহার উষ্ণতার মতই এই ক্রিয়া-শক্তি ব্রহ্মে অবস্থিতা, ঐ মতই ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়াই যেন বহিঃপ্রকাশিতা।

এই ইচ্ছাময়ী ক্রিয়াশক্তি সাকারা মূর্ত্তিমতী না হইলে পর আকারযুক্ত মূর্ত্তি বিশ্বের প্রসবিত্রী হইতে পারে না—তাই কালী, গৌরী, চণ্ডিকা, জয়া, বিজয়া, সরস্বতী, গৌরী নামে খ্যাতা।

যখন ভয়ঙ্করী দৈত্য-বিনাশিনী ক্ষুরধার অপেক্ষাও তীক্ষ্ণা—তখন চণ্ডিকা। যখন সর্ব্বত্র জয়লাভ করতঃ সন্তানগণের জয়দাত্রী—তখন জয়া। যখন নিখিল-জ্ঞানরাশি বিশ্বে বিকীর্ণ করতঃ অজ্ঞানান্ধতা ঘুচাইয়া দেন, তখন সরস্বতী। যখন গৌরাঙ্গী বালিকা—তখন গৌরী। এই কালিকা কেবলই ভয়ঙ্করী বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একাংশ মাত্রই জানেন। কালী যদি কেবল ভয়ঙ্করী হইবেন তবে—

অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ পাণিকাং
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং

বলিয়া ভক্তগণ ধ্যান করিত না। দুষ্ট সন্তানের কাছে মা কখন শাসনদণ্ড হস্তে দণ্ডায়মানা ভীষণা, কখন স্নেহময়ী বাষ্পাকুলিত-লোচনা বরদায়িনী।

এই কালিকা সৃষ্টির ইচ্ছা মাত্র। ব্রহ্মের সংকল্পময়ী ক্রিয়া মাত্র। স্বরূপতঃ স্বতন্ত্রসত্তা না থাকিলেও স্বতন্ত্রসত্তা বিশিষ্টা বলিয়া বোধ হয়। চৈতন্যসত্তাবিশিষ্টা—তাই সত্য। যুগে যুগে কার্য্য সিদ্ধার্থ আবির্ভূতা—তাই নিত্য। স্বপ্নে দৃষ্ট নগরাদিপ্রত্যয় স্বপ্নকালে সত্যরূপেই প্রতিভাত হয় বলিয়া সত্য। এই সৃষ্টি-খেলা যতদিন থাকিবে, ততদিন এই মায়ারূপিনী কালিকা বিদ্যমানা রহিবে। যতদিন অগ্নি, ততদিনই তাহার দাহিকাশক্তি, যতদিন মণি, ততদিনই তাহার প্রভা। দাহিকাশূন্য অগ্নি, প্রভাশূন্য মণির অবস্থিতি সম্ভবে না, আবার অগ্নি ও মণি না থাকিলেও দাহিকা ও প্রভা থাকে না। পরস্পরের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। কালিকা প্রকৃতি, শিব পুরুষ। কালিকা মাতা, শিব পিতা। কারণে শক্তি নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত থাকিয়া পরে কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়।

যতদিন এই সৃষ্টি ততদিনই সৃষ্টি নিদান-ভূতাই বল,সৃষ্টি রূপিণীই বল কালিকা ততদিন। ব্রহ্ম যতদিন সগুণ সাকার সক্রিয়; ইচ্ছাও তত-দিন ত্রিগুণা, ভক্তানুকম্পার্থ ধৃতবিগ্রহা সক্রিয়া। যখন মহাপ্রলয়ে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ তাহাদের মূল প্রকৃতিতে মিশাইয়া যাইবে, এই সমষ্টিভূত মূল প্রকৃতি কালিকাদেবী ইচ্ছার মতই পরমেশ্বর শিব দেহে বিলীন হইয়া যাইবে। শিবের অঙ্গে কালিকা মিশিয়া অদ্বৈত শিব হইবে; সিসৃক্ষা পরম চৈতন্যে লয় পাইবে। এই কালিকা নদী প্রথম মহাদেবরূপ মহাসাগর হইতে যখন বাহির হয়েন, তখন ক্ষীণা স্বচ্ছসলিলা। ক্রমে নানা-ভাবে বিবর্ত্তিতা, নানারূপে প্রকটিতা, নানাপথে প্রবাহিতা হইয়া শেষে মহাসাগরোপম পরম ব্রহ্মে পতিত হয়। মহাসাগরে মিশিবার পূর্ব্বে নদী বিশালকায়া ভয়ঙ্করী তাণ্ডবনর্ত্তনশীলা। মহাকালে মিশিবার পূর্ব্বেও এই জগজ্জননী মহামায়া কৃষ্ণা, ভীষণা ধেই ধেই রূপে নৃত্য পরায়ণা। যেন শ্যামলা কৃষ্ণকায়া অমাবস্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া জগতের বক্ষে বিচরণমানা। সেই তাণ্ডব নৃত্যের ফলে পৃথিবী সরিয়া গেল, জল-রাশি আসিয়া সারা বিশ্ব প্লাবিত করিল, মাথার উপর ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু বহিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া লোলজিহ্ব অগ্নি শতশিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিল, পরে কালিকা যেমনই শিবকে গাঢ়ভাবে স্পর্শ করিলেন, অমনই উভয়ে মিশিয়া একমেবাদ্বৈতং হইয়া গেলেন। তখন বিরাজ-মান রহিল অনন্ত চিদাকাশ। স্পন্দময়ী ইচ্ছা প্রশান্ত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন রহিল।

রাম উবাচ—

ভগবান্ শিবসংস্পৃষ্টা সা শিবা পরমেশ্বরী।
কিমর্থমাগতা শাস্তিসিতে মে ব্রূহি তত্বত ॥

বশিষ্ঠ উবাচ—

সা রাম প্রকৃতিঃ প্রোক্তা শিবেচ্ছা পরমেশ্বরী।
জগন্মায়েতি বিখ্যাতা স্পন্দশক্তির কৃত্রিমা ॥
স পরঃ প্রকৃতেঃ প্রোক্তঃ পুরুষঃ পচনাকৃতিঃ।
শিবরূপধরঃ শান্তঃ শরদাকাশ শান্তিমাং ॥

ভ্রমতি প্রকৃতিস্তাবৎ সংসারে ভ্রম রূপিনী।
স্পন্দমাতাত্মিকা স্বেচ্ছা চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরী॥
যাবন্ন পশ্যতি শিবং নিত্য তৃপ্তমনাময়ং।
অজরং পরমাগুন্ত বর্জ্জিতং বর্জ্জিত স্বয়ং॥

যোগবাশিষ্ঠ

রাম বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! শিবকে স্পর্শ করিবামাত্র পরমেশ্বরী শিবা কালিকাদেবী কি নিমিত্ত শান্ত হইলেন?

বশিষ্ঠদেব উত্তর দিলেন—"এই শিবা কালিকাই জগতের মূল প্রকৃতি বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। ইহাই সিসৃক্ষা শিবের ইচ্ছা, ইনিই পরমেশ্বরী। এই অকৃত্রিম স্বাভাবিক স্পন্দনশক্তিই মহামায়া-রূপে বিখ্যাত। এই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পৃথক পবিত্র পুরুষ—শিব। এই পুরুষ শারদাকাশের মত নির্ম্মল ও শান্ত,এই পরম পুরুষের ইচ্ছারূপা স্পন্দন-ময়ী চৈতন্যশক্তি ভ্রমরূপিনী (সর্ব্বজন ভ্রান্তি বিধা-য়িনী) মহামায়া রূপে সংসারে নিরন্তরই ভ্রম-মানা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিত্যতৃপ্ত অনাময়, অনাদি, অনন্ত অব্যয় শিবকে না দেখিতে পান, ততক্ষণই ইনি নৃত্য করেন।" যেমনই শিবকে দেখেন, যেমনই স্পর্শ করেন, অমনই স্বপ্নের মত প্রতিবিম্বের মত মিলিয়া যান্। তখন আর স্বতন্ত্রসত্তা দৃষ্ট হয় না, স্বতন্ত্র কার্য্য উপলব্ধ হয় না।

এক্ষণে আপত্তি উঠিতে পারে, কালিকা ত শিবকে দেখেন, স্পর্শ করেন, তবে আবার যেমনই দেখেন, স্পর্শ করেন, অমনই মিলিয়া যান কেন?

মায়ামুগ্ধ জীব মায়া-আবরণ বশে যেমন স্বভাবসিদ্ধ আপনার সত্যস্বরূপ দেখিতে পায় না, সুষুপ্তে স্ব স্বরূপে লীন হইয়াও প্রকৃত পরমানন্দ ব্রহ্মস্পর্শ বলিয়া বুঝিতে পারে না; তদ্রূপ এই কালিকাও নিজে মায়ারূপিণী ভ্রান্তি বিধায়িনী বলিয়াই হউক বা প্রকৃতি সিদ্ধ লীলা বশতঃই হউক, প্রকৃত অদ্বৈতভাবে আপনার সত্ত্বা লোপ করিয়া শিবকে দেখেন না, সে ভাবে স্পর্শ করেন না। আপনার পতি-বক্ষে যখন দিগম্বরী হইয়া কালিকা দেবী দণ্ডায়মানা, তখন তিনি উদ্ভ্রান্তা, অপ্রকৃতিস্থা, সৃষ্টির মঙ্গলের জন্যই সন্তানগণের ভবিষ্যৎ হিতের জন্যই আজি মাতা হইয়া সন্তান ধ্বংসে তৎপরা, আপনার হৃৎপিণ্ড বলি দিতে উদ্যতা—সে সময়ে মাতা কি স্নেহময়ী থাকিতে পারেন, স্নেহময়ী থাকিলে কি ঐ ধ্বংস-যজ্ঞ করিতে পারেন? কাজেই উদ্ভ্রান্তা, অপ্রকৃতিস্থা, স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা অপরিত্যজ্য অলঙ্কার লজ্জা পর্য্যন্ত ত্যাগে অকুণ্ঠিত চিত্তা। আপনার প্রিয়তম পতিদেব মহাদেব পদতলে শয়ান—সে জ্ঞান কি আছে? কাজেই সে অদ্বৈত ভাবে—সে একমেবাদ্বিতীয়ং হইয়া শিবকে দেখিতেছেন না, স্পর্শও করিতেছেন না। যেমনই স্পর্শ, অমনই আপন সত্বার লয়। ব্যবহারিক জগতের বিনাশ।

বাড়ঽবাঽগ্নিঃ স্ব নাশায় বহন্ত্যোবাম্বুলেখয়া।

ঊর্ম্মিমালা যেমন নিজের নাশের জন্যই বাড়বাগ্নিতে গিয়া পড়ে, এই কালিকাদেবী আপনার সত্বার নাশের জন্যই মহাকালে মিশিলেন। প্রকৃতই হরগৌরী মিলন হইয়া গেল, পুরুষ-প্রকৃতি একত্রে পরিণত হইল। নদী সমুদ্রে পড়িলে আর নদীত্ব থাকে না, সমুদ্রে

আপন সত্তা বিলীন করে, কারণ সমুদ্র হইতেই নদীর জন্ম, পরিণতি সমুদ্রেই হইবে। সিসৃক্ষা-রূপা মহামায়া কালিকার উৎপত্তি দেবাদিদেব হইতে, পরিণতি দেবাদিদেবেই। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, কারণেই কার্য্যের লয়। অথবা কারণই কার্য্যাকারে, আবার কার্য্যই পরিণামে কারণাকার ধারণ করে। শিবেরই বহির্বিকাশ স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া কালিকা আবার শিবেই মিলিয়া গেলেন।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যখন সংহৃত, তখন ইচ্ছার বিকাশ বা কার্য্য দেখা যায় না বলিয়া কি সে ইচ্ছা তাঁহার মধ্যে নাই? নদী সমুদ্রে মিশিলেও কি সে নদী সমুদ্রের ভিতরে অবস্থিত নহে? তদ্রূপ এই ইচ্ছা ব্রহ্মে বিলীনা হইলেও ব্রহ্মেই অবস্থিতা, আবার সৃষ্টির পূর্ব্বে আবির্ভূতা! সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ের পরের অবস্থা সৃষ্টিরাজ্য-বাসী আমাদের মনোবৃত্তির আয়ত্তে আইসে না। কাজেই সৃষ্টির পর মহাপ্রলয়ের পর যাহা, তাহাই আমাদের বেদ্য; উহাই আমাদের রাজ্য। এই রাজ্যে সগুণ সাকার ইচ্ছাময় দেহধারী পরমেশ্বর পরমপিতা শিব, কৃষ্ণই আমাদের আরাধ্য। ত্রিগুণা সাকারা ইচ্ছাময়ী মূর্ত্তিধারিণী জগন্মাতা কালিকাই আরাধ্যা।

অগ্নির অপেক্ষা দাহিকাশক্তির সহিতই দাহ-কার্য্যের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। কারণ মণিমন্ত্র যোগে নিরুদ্ধ দাহিকাশক্তি অগ্নি দগ্ধ করে না। বিশ্ববাসী আমাদের সহিত কালিকাদেবীর যত নিকট সম্বন্ধ, তত নিকট সম্বন্ধ পরমেশ্বরের সহিত নহে। দাহিকাশক্তির সাক্ষাৎ কারণ অগ্নি; কিন্তু দাহ-কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ দাহিকাশক্তি, বিশ্ব-কার্য্যেরও সাক্ষাৎ কারণ শক্তি। শক্তির সাক্ষাৎ কারণ পরমেশ্বর। শক্তি আমাদের গুরু, পরমেশ্বর আমাদের গুরুর গুরু। গুরুই আমাদের প্রধানতঃ প্রকৃষ্ট দেবতা। কারণ ও কার্য্যের মধ্যস্থলে শক্তি। কারণের পরবর্ত্তিনী, কার্য্যের পূর্ব্ব-বর্ত্তিনী অবস্থা—শক্তি। আর দাহিকা যেমন অগ্নিছাড়া থাকে না, তদ্রূপ পরমেশ্বরী শক্তি, কখনও শক্তিমান্ পরমেশ্বর ব্যতীত থাকে না। কাজেই যখনই শক্তিকে আমরা উপাসনা করিব, তখন ব্রহ্ম বিধৌতা, বা ব্রহ্মচৈতন্য-বিশিষ্টা-রূপে উপাসনা করিতেই হইবে। আমরা আছি মায়ার পুঁটুলির মধ্যে; মহাপ্রলয়ান্তে আমরা সেই পুঁটুলির মধ্যেই থাকিব। পুঁটুলি ব্রহ্মে মিশিবে বটে, আমরা তাহা জানিব না, আমরা ভাবিব—পুঁটুলির মধ্যেই আছি। আবার সৃষ্টিকালেই ঐ পুঁটুলির সহিতই বাহির হইব। তবে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যাহার, তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য। পিতা অপেক্ষা জননীর সহিত সন্তানের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। সন্তান প্রসূত হইবার সময়ে আর পিতার অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই, লালনে মাতার আবশ্যকতা। এই শক্তি কারণ তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শক্তি উপাসনাই আমাদের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। আর বাঙ্গালায় শক্তির উপাসক সংখ্যাই অধিক। তবে ইহার বিরুদ্ধ দিকও আছে। কালী-তত্ত্ব অদ্য প্রতিপাদ্য, বিরুদ্ধ দিকটি এ প্রবন্ধে দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

ব্রহ্মময়ী কালী আমাদের মা। সন্তানের

আহ্বান মায়ের কর্ণে যত বাজে, পিতার তত নহে। আর এই বিশ্বাসও সন্তানের মঙ্গলকর। পরমেশ্বরকে পিতা বল, মাতা বল, সখা বল, প্রিয় বল, শাস্তা বল, রাজা বল—সবই ত উপচার। তবে মাতৃত্বের উপচারই যখন অধিক মধুর, তখন তাহারই অবলম্বন শ্রেয়।

শ্রীরামসহায় ভট্টাচার্য্য।

প্রভাত কমল।

শরৎ কমল কলি
ফুটিল না এ ধরায়,
বরষ পূরণ করি
মুকুলে ঝরিল হায়!
প্রভাতে "প্রভাত" যবে
এসেছিল বসুধায়,
পুরবাসী আসি যবে
হেরি মুখ-চন্দ্রমায়,
লয়েছিল কোলে তুলে
বিধি-দত্ত নিধিটায়;
মধুর রোদন রোলে
যেন সুধা বরিষয়।
তৃতীয় দিবস পরে
তোর যে জননী হায়,
উন্মাদিনী ব্যাধি-ঘোরে
তোরে যে বধিতে ধায়।
স্তন-দুগ্ধ নাহি দিলে
কাঁদে সদা উভরায়,
ভাজে বুঝি মুষ্টি তুলে
নবনীত সম কায়।
অমূল্য মাণিক জ্ঞানে
দিনু পেতে এ হিয়ায়,
শারদ প্রতিমা ধ্যানে
না আনিনু কল্পনায়।
দিবানিশি তোরে লয়ে
ঠেকিলাম ঘোর দায়,
গেল ষষ্ঠীপূজা হয়ে
অশৌচ দূরে পলায়।
চন্দ্রকলা সম বাড়ে
ক্ষীণ বপু সুষমায়,
ক্রমশঃ অশক্ত ঘাড়ে
দিন দিন বল পায়।
আধ আধ বুলিগুলি
বল তোরে কে শিখায়?
শত্রুও পরাণ খুলি
ফিরে দেখে মিত্রতায়।
'বাবা' এ, 'দাদা' এ বলি
ডাকিলি যে কত হায়,
বরষ গিয়াছে চলি
আয় "প্রভা"! ফিরে আয়।
অলক তিলক দিয়ে
সাজাইব পুনরায়,
গোপাল ভাবিয়ে তোরে
(দিব) নাড়ু ক্ষুধার বেলায়।
পরাব মতির মালা
সাজিবে ভাল গলায়,
সুবর্ণ-নির্ম্মিত বালা
পরাইয়ে দিব আয়।
নেচে নেচে হেলে দুলে
খেল এসে বসুধায়,

যাবে সবে দুঃখ ভুলে
বাজিবে নূপুর পায়।
ছিল কি রে মনে তোর
ব্যথা দিবি মো সবায় !
এসেছিলি কচি চোর
দিলি সিঁধ বুড়া প্রায়।
ছদ্মবেশে হেসে হেসে
সাধিলি রে শত্রুতায়,
পলাইলি নিজ দেশে
নিশীথের জ্যোৎস্নায়।
অভাগিনী দেখি মোরে
দলি গেলি পায় পায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে
জনম কাটিল হায়।
নিলি ভাল প্রতিশোধ
মিহিরের যাদুমণি,
না হইতে জ্ঞানবোধ
গেলি শেল হৃদে হানি।
কুক্ষণে দারুণ ব্যাধি
প্রবেশি কোমল দেহে
না মানিল মন্ত্রৌষধি
ফেলে দিল কাল গেহে।
যে ব্যথায় হৃদি মম
জ্বলিতেছে উভরায়,
"প্রভাত" না দিলি কম
সেই জ্বালা পুনরায়।
আজিও জননী তোর
মগন প্রলাপ রোগে,
বহে না নয়ন-লোর
বুক-চেরা-ধন-শোকে।

ধ্রুবলালের মাতা।
মর্ম্মভেদী রচয়িত্রী।

বিধান।

হরেন্দ্রনারায়ণ আপনার শয়ন-কক্ষে বসিয়া কালিদাসের কুমারসম্ভব পড়িতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কাহার আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, পাঠে তাঁহার তেমন মন ছিল না। এমন সময় হিরণকুমার গৃহ-প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বাবা! আমায় ডেকেছেন কেন?" হরেন্দ্র-নারায়ণ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন--"হাঁ, কোনও বিশেষ কাজের জন্য তোমায় ডেকেছি, এইখানে এসে ব'স।" হিরণকুমার বসিলে হরেন্দ্রনারায়ণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—"দেখ,আজ আমি তোমায় যে কথা বল্‌ব,হয়ত সে কথাগুলি তোমার ভাল লাগ্‌বে না; কিন্তু তুমি আমার একমাত্র সন্তান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পার্‌বে, আমি তোমার ভালর জন্যই এ সমস্ত কথা বল্‌ছি। শুন্‌লাম, তুমি নাকি সেই হতভাগ্য রাঘব ঘোষের মেয়েটাকে বিবাহ কর্‌বার মনস্থ করেছ? কথাটা সত্য কি না?" হিরণকুমার কোনও কথা কহিল না। হিরণকুমারকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় বলিলেন—"দেখ, তুমি এ সংকল্প পরিত্যাগ কর। সামান্য খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে আমার বংশ-মর্য্যাদার মাথায় পদাঘাত কোরোনা। অনেক রাজারাজড়ার বাটী থেকে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ আস্‌ছে; আর তা' ছাড়া রাঘব ঘোষের সঙ্গে আমাদের চলন নাই, সমাজের সকলে মিলে তা'কে "একঘরে" করেছে, তা'

বোধ হয় তোমার অজানা নাই। তোমাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এখন তোমার ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে; একটা ঠেকো ঘরের মেয়েকে বিবাহ করে তোমার পিতার উন্নত মস্তক অবনত কোরোনা। তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমার উচিত নয় কি, যে সে মান-সম্ভ্রম যা'তে বজায় থাকে, তোমার পিতার মুখ যা'তে উজ্জ্বল হয়, পাঁচজনে যা'তে তোমায় না দোষে—এমন কাজ করা? আরও শুন্‌লাম, তুমি নাকি রমেশের কাছে বলেছ যে, যদি আমি এ'তে সম্মতি না দি, যদি এর জন্য তোমায় সব ছাড়তে হয়, তা'তেও তুমি পেছ্‌পাঁও হ'বে না? এরূপ মূর্খের মত কথা বল্‌তে তোমার কি একটু লজ্জা বোধ হ'ল না? তোমার পিতামাতা আগে, না সেই রাঘব ঘোষের কন্যা আগে? এ রকম মতলব তোমায় কে দিয়েছে? বেশী লেখা পড়া শেখার কি এই ফল?" হিরণকুমার ভয়ে, লজ্জায়, অভিমানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ হইতে বাক্য-নিঃসরণ হইতেছিল না, কোনও উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময় মস্তিস্কের যেমন একটা দারুণ অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহারও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহার বুকের ভিতরের দ্রুত স্পন্দনের শব্দ তাহার কর্ণে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। পুত্রের এপ্রকার অবস্থার দিকে লক্ষ্য না করিয়া হরেন্দ্রনারায়ণ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—"দেখ হিরণ! শেষ কথা তোমায় বলে রাখি, যদি আমাকে অপমান করবার ইচ্ছা থাকে, যদি পিতার প্রতি তোমার কিছুমাত্র ভক্তি না থাকে, তুমি যা' খুসী করগে যাও। মনে জেনো, আমার অবাধ্যতাচরণ করলে, আমার বাটীতে তোমার স্থান হ'বে না। আজ হ'তে আমি তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিলাম, যাও—বেশ ঠাণ্ডা হয়ে ভেবে দেখগে। একদিকে আমার অগাধ ধন-সম্পত্তির ও পূর্ব্বপুরুষের মান-মর্য্যাদা সহ অমূল্য পিতৃ-স্নেহ, আর অন্যদিকে একটা হতভাগা-ঘরের মেয়েকে বিবাহ করে জন্মের মত কলঙ্ক কেনা, এই দুইয়ের কোনটা বাঞ্ছনীয় এবং ধর্ম্মতঃ পালনীয়, বেশ ভাল করে বুঝে সাত দিনের ভিতর আমায় জানাবে। যদি তোমার সংকল্প বজায় রাখতে চাও, যদি তোমার পিতার আদেশ এবং অনুরোধ তোমার বিদ্যা-গর্ব্বোন্নত জ্ঞানের কাছে নগন্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তা' হ'লে তুমি আমার বাটী হ'তে দূর হয়ে যেও। অবাধ্য, বিবেকহীন, হতভাগ্য সন্তান থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। যাও, ভেবে দেখগে।" হিরণকুমার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নিজের পাঠ গৃহে আসিয়া হিরণকুমার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, পরে শয্যায় শুইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। আকুল-কণ্ঠে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"ভগবান! বলে দাও, কোন পথ অবলম্বন করব! একদিকে মর্ত্তের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতার আদেশ, স্নেহময়ী জননীর সবিনয় অনুরোধ, আর অন্য দিকে অভাগিনী কিশোরীর অফুরন্ত স্বর্গীয় প্রেম; কোন পথে যাই! কন্যাদায় গ্রস্থ রাঘব ঘোষের মান রাখি, না আমার জন্মদাতা পিতা, আমার স্বর্গাদপী গরিয়সী মায়ের আদেশ পালন করি? বিবাহ যদি না করি, ত কিশোরীর কি

হবে? সে যে আমা বই আর জানে না, সে যে আমাতে তার প্রাণ-সমর্পণ করেছে, আমি ছাড়া সে যে আর কাহাকেও বিবাহ করতে সম্মত হবে না। হায় কিশোরী! কেন তুমি আমায় ভাল-বেসে ছিলে! কেন আমার মত হতভাগ্যের অনুরক্তা হয়ে ছিলে! হায়, হায়,! বুঝি সব যায়! একদিন—জ্যোস্না বিধৌত শ্যামল তৃণ-শয্যার উপর বসে দুইজনে পরস্পর প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়েছিলাম, যে জীবনে মরণে কেহ কাহাকেও ত্যাগ করব না। তখন মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছিল, স্নিগ্ধ সমীরণ অর্দ্ধমুকুলিত যুঁথিকার সুবাস বহন করে আমাদের উপহার দিতেছিল, পাপিয়ার পিউ পিউ তান, রাত্রির গভীর নিস্ত-ব্ধতা ভঙ্গ করে, আমাদের মিলিত হৃদয়-বীণার তারে তারে ঝঙ্কার তুলে দিতেছিল। সেই সুন্দর মুখ খানি, অর্দ্ধবিকশিত পদ্ম-কোরকের মত ঢলঢলে মুখ খানি, অতৃপ্ত নয়নে দেখে দেখেও আমার প্রাণের আশা, জীবনের সাধ মিটিতেছিল না। সেইদিন—আর—এইদিন। কত প্রভেদ, কত পরিবর্ত্তিত। আজ আমার এমন কি তাদের বাটী যাবারও অধিকার নাই। হা ঈশ্বর! যদি এমনই করবে, তবে কেন সে রমণীয় মূর্ত্তি মর্ত্তে অতুলনা, সেবায় দেবী, অভাবের সান্ত্বনা, সে পবিত্র স্বর্গীয় রূপ আমার চোখের সম্মুখে ধরেছিলে! অভাগিনী কিশোরী তোমার চরণে কি অপরাধ করেছে যে তা'র এই কিশোর বয়সে তাকে এই শাস্তি দিতে মনস্থ করেছ! সত্যই কি পাবনা! সত্যই কি কিশোরীকে আমার গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ কর্‌বার অবসর মিল্‌বে না! ওঃ! প্রাণ যায়! আর ভাবতে পারি না। যা হ'বার হবে। আমার সব যায় যাক্, প্রাণের সমস্ত তার ছিঁড়ে যায় যাক্, আজীবন জ্বলে পুড়ে মর্‌ব—এক তীব্র নিরাশার জ্বালা বুকে করে সারা জন্ম উন্মাদের মত ছুটে ছুটে বেড়াব, তথাপি পিতামাতার অবাধ্যতাচরণ করব না! কিশোরীকে বুঝিয়ে বল্‌ব, যেন সে অন্য সৎপাত্র দেখে তাহাকে বিবাহ করে, আমার আশা যেন ত্যাগ করে। আমার সামান্য স্মৃতিটুকুও যেন সে মুছে ফেলে। বুঝলাম, আমার জীবনে সুখ নাই, আমি যন্ত্রণা পেতেই জন্মগ্রহণ করেছি। যাকে ভালবাসি, যাকে বিবাহ করলে আমি সুখী হই, সামান্য একটা অলীক নিন্দার উপর নির্ভর করে পিতা আমাকে আজীবন কষ্ট দিতে প্রস্তুত কেন—তা'ত বুঝতে পারি না। সহায়হীন, সম্পত্তিহীন দরিদ্র রাঘব ঘোষ কি এমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ করে-ছেন যে সমাজ তা'কে এই ভয়ানক শাস্তি দিলে! ধন্য সমাজ! যা'দের অর্থ আছে, তারা শত সহস্র দোষ করলেও সমাজ কোনও কথা বলে না। অর্থহীন রাঘব ঘোষ অপরাধের মধ্যে তাঁর বয়স্থা কন্যার বিবাহ দিতে পাচ্ছেন না, এই কারণে তিনি আজ সমাজ পরিত্যক্ত। এই জন্য তিনি আজ সমাজপতিদের সহানুভূতির পরিবর্ত্তে তা'দের দ্বারা ঘৃণিত এবং লাঞ্ছিত। পিতা ইচ্ছা করলেই রাঘব ঘোষকে আবার সমাজে স্থান দিতে পারেন, কিন্তু তাহা তিনি দিবেন না! বরং রাঘব ঘোষ যা'তে সমাজে মিশ্‌তে না পারেন, সেই চেষ্টাই করচেন। ধন্য সমাজ! ধন্য সমাজপতি!" হিরণকুমার শয্যায় শুইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

জননী গৌরীদেবী পুত্রকে, আহার করিবার জন্য ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু হিরণকুমারের তখন আহারে রুচি ছিল না, বলিল—"মা আজ আমার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্চে, আজ আর কিছু খাব না।" জননী গৃহের দ্বার খুলিতে অনুরোধ করিলেন, হিরণ দ্বার খুলিল না। বলিল—"মা আজ আর যেন আমায় কেউ বিরক্ত না করে, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।" কি কারণে পুত্র আজ দ্বার পর্য্যন্ত খুলিল না, এবং অসুখের ভান করিয়া আহারও করিল না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না, ভাবিলেন এখন বলা নিষ্প্রয়োজন। গৌরীদেবী চলিয়া যাইলে হিরণ অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পুত্রকে ভৎসনা করিবার পর হরেন্দ্রনারায়ণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক নূতন কৌশল জাল বিস্তার করিলেন। একদিন তিনি রাঘবঘোষকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ রাঘব! তোমার কন্যা কিশোরীর বিবাহের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও তার বিবাহ দিতেছ না কেন? রাঘব বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে, সেত আপনাদেরই দয়া। আপনারা যদি বিনা অপরাধে আমায় একঘরে না করতেন তা' হ'লে আমার আজ এ দুর্দ্দশা কেন বলুন। অর্থহীন দরিদ্র আমি, আপনাদের পাঁচজনের মুখ চেয়ে এ গ্রামে বাস করছি, আপনারা ত আর মুখ তুলে চাইলেন না, গরীব বলে একেবারে পায়ে ঠেল্লেন।" হরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"যা হ'বার হয়ে গেছে, আর সেজন্য আমাকে অপরাধী করা তোমার অন্যায়, কারণ, জান ত আমি কা'রও কথায় থাকি না। এখন কথা হচ্চে এই যে, আমার এক নিকট আত্মীয়ের সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হয়েছে; সংসারে আর দ্বিতীয় কর্ত্রী না থাকায় তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন। যদিও তাঁর একটু বয়স হয়েছে, তথাপি এ বিবাহে তোমার কন্যা সুখী ভিন্ন অসুখী হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। আরও এ বিবাহ হ'লে সমাজে তুমি আবার তোমার পূর্ব্বাবস্থা ও লুপ্তমান ফিরে পাবে। এখন তোমার মত হ'লেই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়।" রাঘব বাবু বলিলেন—"এতে আর আমার অমত কি বলুন? আপনি আমাদের গ্রামের মধ্যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সদ্বিবেচক। আপনি যখন বলছেন—তখন আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি বলুন! মনে মনে ভাবিলেন—"এ এক মন্দ অভিনয় নয়। হিরণ বোধ হয় কিশোরীকে বিবাহ করবার বিষয়ে কোনও কথা বলে থাকবে, না হলে হঠাৎ আমার উপর এতটা দয়া হ'ল কেন? পাছে হিরণ ইঁহার অমতে আমার কন্যাকে বিবাহ করে, এইজন্যই বোধ হয় এই খেলা খেলিলেন।" হিরণের সহিত কিশোরীর বিবাহের প্রস্তাবটা উত্থাপন করিতে তাহার সাহস হইল না। ভাবিলেন—এখন যেমন করিয়া হউক কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হই। বিবাহ হইয়া গেলে আবার সব দিক ঠিক হইয়া যাইবে। হরেন্দ্র বাবু বলিলেন—"যদি এতে তোমার কোনও অমত না থাকে, তা' হ'লে তুমি বিবাহের উদ্যোগ করগে যাও। আগামী ১৭ই তারিখে আমার বাটী হ'তেই বিবাহ কার্য্য সমাধা হবে।"

রাঘব ঘোষকে বিদায় দিয়া হরেন্দ্র বাবু হিরণকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হিরণ আসিলে বলিলেন—"হিরণ! বসন্তপুরের নায়েব মহাশয় পত্র লিখেছেন যে, সেখানকার প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে বড় অত্যাচার আরম্ভ করেছে, নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় আমি এখন কোনও মতে তথায় যেতে পারছি না, অতএব তুমি আজই বসন্তপুর উদ্দেশে যাত্রা কর এবং সেখানকার হালচাল বেশ ভাল করে দেখে শুনে এস।" "যে আজ্ঞে বলিয়া" হিরণকুমার সেই রাত্রেই বসন্তপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

কিশোরী যখন শুনিল যে তাহার বিবাহ হিরণের সহিত না হইয়া অপরের সহিত স্থির হইয়াছে, তখন সে প্রমাদ গণিল। কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ক্ষুদ্র, পরাধীনা, অবলা নারী, তাহার কতটুকু শক্তি যে সে এ বিবাহে প্রতিবাদ করে। অনেক ভাবিয়া সে হিরণকে এক পত্র লিখিল—*প্রিয়তম! বোধ* হয় সমস্তই শুনিয়া থাকিবে, এ অবস্থায় কি করা উচিত পত্র পাঠ জানাইবে। দাসী বড় বিপদে পড়িয়া আজ তোমাকে পত্র লিখিতেছে। বিপন্নাকে তুমি না রক্ষা করিলে আর উপায় নাই।" দেখিতে দেখিতে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল কিন্তু তাহার পত্রের কোনও উত্তর আসিল না। কিশোরী পত্র-বাহিকাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিল যে হিরণকুমার এখানে নাই, তখন সে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার পিতাকে বিবাহে অসম্মতির কথা জ্ঞাপন করিল। রাঘব ঘোষ বিরক্তির সহিত বলিলেন —"কিশোরী! অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায়, অনেক লোকের হাতে পায়ে ধরে তোমার বিবাহের যোগাড় করেছি। আমি যা ভাল বুঝব তাই করব, এ বিষয়ে তোমার মতামত লয়ে কাজ করতে আমি বাধ্য নই। যদি সম্মুখে পিতৃহত্যা দেখিতে না চাও, যদি আমার অবস্থা স্মরণ করে তোমার এ বৃদ্ধ পিতার প্রতি এতটুকুও দয়া হয়, ত এ বিবাহে অসম্মতি দিও না। এ বিবাহ অবশ্যম্ভাবী।" কিশোরী আর কথাটী কহিল না, সে নিজেকে নিজে বলি দিবার জন্য প্রাণের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।

যথাসময়ে এক হতভাগ্য বৃদ্ধের করে নিজের প্রাণের অধিক কিশোরীকে সমর্পণ করিয়া রাঘব বাবু সমাজের মান বজায় রাখিলেন।

বিবাহের ৩।৪ মাস পরে হিরণকুমার বাটী আসিবার জন্য বসন্তপুর হইতে রওনা হইল। এই ৩।৪ মাস তাহার বড় কষ্টে কাটিয়াছে। *কিশোরীকে প্রায়ই পত্র লিখিত কিন্তু কোনও* উত্তর পাইত না। বাটী আসিবার পথেই কিশোরীদের গৃহ। হিরণকুমার বাটী না গিয়া কিশোরীকে দেখিবার জন্য বরাবর তাহাদের গৃহে গমন করিল। মনে অসীম দুশ্চিন্তা লইয়া, প্রাণে দারুণ অভাব লইয়া ব্যথিত, উৎপীড়িত নিরাশাক্লিষ্ট হিরণকুমার কিশোরীদের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু কিশোরীকে ডাকিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে ভাবিতেছিল—"হয়ত কিশোরী এ বাটীতে নাই, হয়ত সে আমায় ভুলিয়া গিয়াছে! হয়ত তাহার অপরের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া

আমি প্রাণ ধারণ করিব, কি লইয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইব! হিরণ মনে করিয়াছিল যে এবার পিতার হাতে পায়ে ধরিয়া পিতার অনুমতি ভিক্ষা লইবে, কিন্তু যদি কিশোরীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে এ প্রাণ রাখিবে না। অনেক কষ্টে প্রাণের আবেগ চাপিয়া সে রুদ্ধ-কণ্ঠে ডাকিল—"কিশোরী" গৃহের দ্বার খুলিয়া এক নিরাভরণা যুবতী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হিরণ ছুটিয়া যাইয়া তাহার প্রাণের প্রাণ, আরাধ্যা দেবীর বৈধব্যদশা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল. বলিল—"কিশোরী! একি? এ সাজে তোমায় কে সাজালে? ধীরে ধীরে সংযতস্বরে কিশোরী উত্তর করিল—"হিরণ, ভাই! অতীতের সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেল। অতীতের সমস্ত কথা ভুলে যাও। যে সম্বোধনে আজ তুমি আমায় ডাকলে সে সম্বোধনের অধিকার আর তোমার নাই ভাই। যে ভাবে তুমি আমায় এতদিন ভেবে আসছ, যে সাজে তুমি আমায় এতদিন সাজিয়ে আসছ, যে প্রেম-যে ভালবাসা আমার জন্য বড় আশায় সঞ্চিত করে রেখেছ, সে সমস্ত গ্রহণ করবার অধিকার আর আমার নাই ভাই। আমি এখন অপরের স্ত্রী। সেই স্বর্গীয় স্বামীর পা দু-খানি ব্যতীত অন্য চিন্তা করলে মহাপাপে পতিত হব। তুমি আমায় ভালবাস জানি, কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান দেবার অবসর ঈশ্বর আমাকে দিলেন কই! আমি বড় হতভাগিনী! আমার জন্য তুমি কেবল কষ্টই ভোগ করলে, কখনও তোমায় সুখী করতে পারলাম না—কখনও তোমার মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না—কখনও তোমার ভালবাসার এতটুকুও ঋণ পরিশোধ করতে পারলাম না। ঈশ্বরের সে ইচ্ছা নয় ভাই! যদি তাঁর সেই ইচ্ছাই হ'ত, যদি তোমার চরণের—যাক্ সে সব কথায় আর কাজ নাই। এখন আমি তোমার কাছে ভ্রাতৃস্নেহের অধিক আর কিছুই কামনা করি না। হিরণ! ভাই আমার! আমার শেষ সাধ পূর্ণ কর। জীবনের সমস্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লয়ে মনের আগুণে দিনরাত জ্বলে পুড়ে মরছি, আর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়ে আমার জ্বালা বাড়িও না। ভাই আমার! ছোট বোন বলে আমায় মনে রেখো। আর একটা কথা—বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু না বললেও নয়। ও প্রাণ ভোলান রূপের জ্যোতিঃ লয়ে তুমি আর আমার সামনে এস না। আমি বড় হীনা, বড় হতভাগিনী! তুমি চিরকাল আমায় সুখী করবার জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ বলে জ্ঞান কর, আজ সে অনুগ্রহ থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রনা। আবার বলি—হিরণ! ভাই আমার! ছোট বোন বলে আমায় মনে রেখো,এই আমার শেষ প্রার্থনা।"

হিরণকুমার পাষাণে গঠিত মূর্ত্তির মত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া কিশোরীর এই সমস্ত হৃদয়ভেদী কথা শুনিতেছিল। সে জীবিত কি মৃত তখন তাহার জ্ঞান ছিল না, সে তখন নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ "হিরণ ভাই আমার" এই শব্দে চমকিত হইয়া দেখিল শ্বেত-বস্ত্রপরিহিতা আলুলায়িত কুন্তলা কিশোরী তাহার ম্লান মূর্ত্তিখানি লইয়া, আয়ত-নয়ন দুটী

তাহারই মুখের দিকে ন্যস্ত করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। "কিশোরী! এ কি শুন্‌লাম!" এই বলিয়া হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে হিরণকুমার সংজ্ঞাহীন দেহে ভূতলে পতিত হইল।

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু-রাজার আদর্শ।

রামচন্দ্র (সত্যপালন)

কান্তগুণ-বিকাশ—প্রজারঞ্জন।

কার্ত্তবীর্য্যে আমরা রাজার ভীম গুণের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি, রামচন্দ্রে আমরা কান্তগুণের পরিচয় পাইব। তাঁহার 'রাম' নামটী কেমন অভিরাম ভাবের প্রকাশক। তিনি কিরূপ সত্যানুরাগী ছিলেন—পিতৃসত্য পালনার্থ রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বনগমনই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। তদীয় অমায়িক ভাব গুহক চণ্ডাল ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতায় পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। রাজনীতির প্রধান ও প্রথম সাম্যগীতি তাঁহার চরিত্রে কিরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা প্রবল, প্রচণ্ড, ক্রূর, সর্ব্বময় প্রভু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জিঘাংসা-পরায়ণ রাবণের বিরাগ-ভাজন হওয়ার ভয়কে তুচ্ছ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যে তৎপক্ষে যোগদান করেন, ইহা হইতেই সবিশেষ প্রকাশিত হয়।

এই নীতি-বলেই আর্য্য অনার্য্য জাতি প্রথম তদীয় ছত্রতলে সম্মিলিত হইয়াছিল। তাঁহার লঙ্কা-বিজয় অনার্য্যদিগের মধ্যে আর্য্য প্রভুত্ব স্থাপনেরই ইতিহাস। তিনিই প্রথম উদার-নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া প্রকৃত রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। প্রজারঞ্জনই তাঁহার রাজত্বের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। এই প্রজারঞ্জনের অনুরোধে তিনি প্রাণপ্রিয়া, জগতে অতুলনীয়া সতীসাধ্বী সীতাদেবীকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই,—

"স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকী মপি।
আরাধনার্থং লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তিমে ব্যথা।"

(উত্তররামচরিতম্)

এই জন্যই "রামরাজ্য" আজও সকল সুশাসিত রাজ্যের উপমাস্থল হইয়া রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বিশালতার ভাব বুঝাইতেও স্থলবিশেষ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে—যেমন সাধারণ কথায় বলা হইয়া থাকে "রামরাজা জুড়িয়া (লইয়া) বসিয়াছে।" ইহা হইতেই রাম শব্দটী বৃহত্ত্ব অর্থ প্রতিপাদক হইয়াই অন্য শব্দের পূর্ব্বপদ-রূপেই বসিয়া থাকে। যথা—'রামতুলসী', রামদা' (দাত্র)। এই অলৌকিক মহত্ত্ব-গুণেই শ্রীরামচন্দ্র অবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। সেই প্রাচীন 'রামরাজ্যের' চিহ্ন মাত্রও এখন বর্ত্তমান নাই বটে কিন্তু হিন্দুর মনোজগতে এখনও রামের রাজত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান।

ভরত (রাজচক্রবর্ত্তী)

সাম্রাজ্য-স্থাপন।

শ্রীরামচন্দ্র আর্য্য-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশাবতংস শকুন্তলা-পুত্র ভরত

আর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনিই প্রকৃত রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন। আমাদের সমগ্র দেশের উপর একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া স্বীয় নামে ইহার 'ভারত' নাম প্রদান পূর্ব্বক তিনিই প্রথম ইহাকে অখণ্ড এক দেশে পরিণত করিলেন।

'ভারতবর্ষ' নাম এখনও তাঁহার সেই অক্ষয় কীর্ত্তিই রক্ষা করিতেছে। কেবল তাঁহার রাজ্যই তাঁহার নামের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার বংশও তাঁহার নামের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মহাকাব্য 'মহাভারত' ভরত-বংশীয়দিগের কীর্ত্তি-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াই এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

নল।

প্রজাপালন, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যপ্রিয়তা, পুণ্যশীলতা, আত্মত্যাগ।

নল রাজা শ্রীরামচন্দ্রেরই ন্যায় প্রজাপালন মুখ্য রাজধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। এই প্রজাপালনে তিনি ন্যায়পরায়ণতাকেই মানদণ্ড স্বরূপ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপই সত্যপ্রিয় ছিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে দয়মন্তী ও তাঁহার মধ্যে পূর্ণাসক্তি জন্মিলেও দয়মন্তীর স্বয়ম্বরে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেবতাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের জন্য দয়মন্তীর নিকট দূতরূপে কার্য্য করিতে তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকৃত হইলেন। নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তিনি দেবতাদিগের পক্ষে দয়মন্তীকে বরণ-বিষয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়াই দয়মন্তী নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পুণ্যশীলতা এত অধিক ছিল যে, কলি দ্বাদশ বৎসর অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার কোন ছিদ্র খুঁজিয়া পায় নাই। তিনি কলির নিগ্রহে অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার এই পবিত্র জীবনের জন্য তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। "পুণ্যশ্লোক নল রাজা" এই বাক্যে এখনও তাঁহার সেই পুণ্যকীর্ত্তি গীত হইয়া থাকে। নল প্রভৃতি রাজগণ পৃথিবীতে এমনই দিব্যপ্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন যে, শুভকার্য্যে যেমন দেবতা-দিগের নাম স্মরণ, সহায় বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে, কোন কার্য্যোপলক্ষে যাত্রাকালে তদ্রূপ ইঁহাদের নামও সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যথা—

"বৈশ্যং পৃথু হৈহয় মর্জ্জুনঞ্চ
শাকুন্তলেয়ং ভরতং নলঞ্চ।
এতান্ নৃপান্ যঃ স্মরন্তি
প্রয়াণে তস্যার্থসিদ্ধিঃ পুনরাগমশ্চ ॥"

'বৈশ্য-পুত্র পৃথু, হৈহয়রাজ অর্জ্জুন (কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন), শকুন্তলাতনয় ভরত, এবং নল এই সকল নৃপতির নাম যিনি যাত্রার সময় স্মরণ করেন, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া পুনরাগমন হয়।' ইহার তাৎপর্য্য এই বলিয়াই বোধ হয়। যেমন রাজার দ্বারা শান্তি রক্ষিত হইলে কোন কার্য্য সম্পাদনে কোন দুষ্ট লোক হইতে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না বা বিঘ্ন ঘটিলেও রাজার দোহাই দিলেই সেই বিঘ্নকারকগণ দণ্ডভয়ে অপসরণ করে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত

লোকোত্তর প্রভাব-সম্পন্ন রাজগণের নামই যেন লোকের শান্তি রক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির (ধর্ম্মরাজ)

সত্যবাদিতা।

যুধিষ্ঠিরের মধ্যে ধর্ম্মভাব এরূপই প্রবল ছিল যে, তিনি সংসারের অশেষ বিঘ্ন, বিপদ, পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যেও কখন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন নাই। বাস্তবিক জীবন-যুদ্ধে তাঁহার ন্যায় অবিচলিত পুরুষ আর দেখা যায় না, এখানে তিনি যথার্থই 'যুধিষ্ঠির'। তদীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড কেবল ধর্ম্মভাবের দ্বারাই গঠিত ছিল। এই ধর্ম্মভাবের দ্বারা সর্ব্বকার্য্যে নিয়মিত হইতেন বলিয়াই তিনি "ধর্ম্ম-পুত্র" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণতা ও সত্যবাদিতা তাঁহার এরূপই প্রকৃতিগত হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের সহিত ইহাদের চিরযোগ সাধিত হইয়াছে। তাই কেহ অতি মাত্রায় সত্যবাদিতার ভাণ করিলে "তিনি যেন ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির" এরূপ বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করা হইয়া থাকে। তিনি একমাত্র ধর্ম্মেতে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্য-শাসন করিতেন, তাই তিনি "ধর্ম্মরাজ" এই অনন্য সাধারণ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্রাট্ পদের উপযুক্ত দেখিয়াই ভারতে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া কুরুক্ষেত্রে মহাসমর সংঘটিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণের পক্ষাশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মই যে যুধিষ্ঠিরের বিজয়ের মূল রহস্য, তাঁহা আমরা নিম্নোদ্ধৃত সুপ্রচলিত বাক্যটীতেই জানিতে পারি—

"জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণ স্ততোধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥"

যুধিষ্ঠিরের বিজয়ের এই মূল রহস্য এখন "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই আকারে পরিণত হইয়া সর্ব্বপ্রকার জয়েরই মূল-রহস্য হইয়াছে।

'ধর্ম্মরাজ' যুধিষ্ঠির আপনার ধর্ম্ম-সম্মত জীবনও শাসনের ফলে সশরীরে স্বর্গারোহণের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা নলও যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে এরূপই উন্নত হইয়াছিলেন যে, লোকের নিকট ইঁহারা দেবপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহারা পুণ্যকীর্ত্তির জন্য ভগবান্ জনার্দ্দনের সহিত একসঙ্গে 'প্রাতঃস্মরণীয়' হইয়া রহিয়াছেন। যথা—

"পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকাচ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

ক্রমশঃ— শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রাজা নীলাম্বর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের বিকাশ।

হংসেশ্বর রায় ঘোড়াঘাট দুর্গে উপস্থিত। সমস্ত রাত্রি কষ্ট পাইয়াছেন, অতএব অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া দুর্গের দ্বারে পৌঁছিলেন। প্রহরী তাঁহাকে বিশেষরূপে জানে; অতএব দ্বার ছাড়িয়া দিল। তিনি প্রবেশ করিয়াই দুর্গাধ্যক্ষের অনুসন্ধান করিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহার

সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না, তিনি একটী কক্ষে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে একজন দাসী আসিয়া বলিল—"আপনি ক্লান্ত হ'য়ে এসেছেন, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করুন, আহার্য্য প্রস্তুত হচ্ছে।" এই কথা বলিয়া দাসী চলিয়া গেল, তিনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই দুর্গাধ্যক্ষ প্রত্যাগমন করিলেন, তিনি হংসেশ্বর রায়কে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। হংসেশ্বর একখানি পত্র বাহির করিয়া দুর্গাধ্যক্ষের হস্তে দিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ বাক্যব্যয় না করিয়া ঐ পত্রখানি খুলিলেন, পত্রখানিতে রাজমোহর অঙ্কিত। তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন—

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত শীতলাকান্ত রায়—

দুর্গাধ্যক্ষ—

ঘোড়াঘাট।

আপনি জানিবেন যে, শীঘ্রই মুসলমানসেনা এই রাজ্য আক্রমণ করিবে। ঘোড়াঘাট দুর্গ এই রাজ্যের দ্বার স্বরূপ, অতএব সেই দুর্গ জয় না করিতে পারিলে তাহারা এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এইজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, এবং সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন। অপরিচিত লোকদিগকে দুর্গে কোনরূপে স্থান দিবেন না এবং রাজাজ্ঞা ব্যতীত দুর্গত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করিবেন না। আপনার সাহস ও বীর্য্যের উপর এই রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যাঁহার মারফত এই গোপনীয় পত্র দিলাম, ইনি অতি বিশ্বাসী জানিবেন। ইতি—

শীতলাকান্ত রায় পত্রখানি পাঠ করিয়া হংসেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন। কত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন, কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। পরামর্শ চলিতেছে—এমন সময়ে দাসী আসিয়া বলিল—"আহার্য্য প্রস্তুত।" দুর্গাধ্যক্ষ এতক্ষণ অতিথির আহারের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, দাসীর কথায় হঠাৎ সব স্মরণ হইল। তিনি মিনতি পূর্ব্বক বলিলেন—"আপনি অতিথি রাজদূত—আমি কর্ত্তব্যের চিন্তায় আপনার অভ্যর্থনা করতে ভুলে গিয়াছিলেম। এখন স্নান করুন, আহারান্তে বিশ্রাম করার পর আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবো।" হংসেশ্বর অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করিতেছিলেন, তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে স্নান করিতে গেলেন, তারপর একটি কক্ষে আহারে বসিলেন। আজও মনে মনে আশা হইল সরসীবালা পরিবেশন করিবে। কিছুক্ষণ পরে একখানি রৌপ্য থালায় অন্ন, অনেকগুলি রৌপ্য বাটীতে বিবিধ ব্যঞ্জন আনিয়া সরসীবালা উপস্থিত হইল। আজ বালিকার বড় লজ্জা বোধ হইতেছিল, কি যেন কি এক নূতন ভাবে সে বিভোর হইল। তাড়াতাড়ি থালা নামাইয়া সে প্রস্থান করিল। কিন্তু একেবারে চলিয়া যাইতেও মন চাহিল না, দ্বারের ফাঁক দিয়া ঐ মনোহর মূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিল। হংসেশ্বরের প্রতিকৃতি তাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল। আবার ভয় হইল কোন দাসী আসিয়া যদি এ ভাবে দেখে—তাহা হইলে আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। যতক্ষণ সরসীবালা গৃহে ছিল ততক্ষণ হংসেশ্বরের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে-

ছিল, কিন্তু যেমন সে চলিয়া গেল, অমনি যেন সব অন্ধকার বোধ হইল। এত ক্ষুধাতেও আহারে রুচি হইল না, মনে মনে করিলেন ভগবান এমন দিন কি দিবেন, যে এই রত্ন তাঁহার হইবে। আহার কোনরূপে শেষ হইল, তিনি বিশ্রামার্থ একটী কক্ষে গিয়া সুসজ্জিত শয্যার উপর শয়ন করিলেন।

যে কক্ষে অদ্য হংসেশ্বর রায় শয়ন করিলেন, সেটি শীতলাকান্ত রায়ের শয়ন-ঘর, তিনি অতিথির সম্মানার্থ সেই ঘরটী ছাড়িয়া দিয়াছেন। সরসীবালা জানিত—তাহার পিতা সেই ঘরে আছেন, অতএব সে ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। শয্যার নিকট উপস্থিত হইয়াই দেখিল, অতিথি সেই স্থানে শয়ন করিয়া আছেন, লজ্জায় তাহার গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন দ্রুতপদে পলায়নের চেষ্টা করিল। হংসেশ্বর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন, হাঠাৎ চক্ষু খুলিলেন—দেখিলেন স্বর্গীয় বিদ্যাধরী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিলেন। সরসীবালা আর পলাইতে পারিল না, একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল। হংসেশ্বর বলিলেন—"সরসীবালা! আজ আমার শুভদিন, এতদিনের আরাধনা আজ সফল হ'ল, দেবী-প্রতিমা আমার সম্মুখে কেন? এপ্রতিমা দেখিবার বা ভাবিবার অধিকার আমার নাই।" সরসীবালা কিছুই উত্তর করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় এ বাক্যে নৃত্য করিতেছিল। হংসেশ্বর পুনরায় বলিলেন—"দেবি! তোমাকে কি পূজিতে আমি অধিকার পাবো? আমি যে স্থানে থাকি—রণে, বনে, সাগরে, সেইস্থানেই এই স্মৃতিখানি হৃদয়ে বসায়ে পূজা করবো। আমার কথা কি তোমার মনে থাকবে?" এবারও সরসীবালা উত্তর করিল না। হংসেশ্বর শয্যা হইতে উঠিয়া সরসীবালার নিকটে দাঁড়াইলেন, সরসীবালা বলিল—"আমি যাই, বাবা আসবেন।" এই কয়েকটি মধুর বাক্য শুনিয়া হংসেশ্বর আনন্দিত হইলেন, তিনি বলিলেন—"সরসি! শীঘ্রই আমাদের যুদ্ধ হবে, যদি বেঁচে থাকি, তবে প্রাণ-মন যথাসর্ব্বস্ব এই দেবীকে অর্পণ ক'রে দিয়ে কৃতার্থ হব। একবার বল আমাকে স্মরণ থাকবে কি না।" এইবার সরসীবালার মুখ ফুটিল, সে বলিল—"চিরদিন থাকবে।" এই কথা বলিয়াই সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, লজ্জায় আর দাঁড়াইতে পারিল না।

হংসেশ্বর বড় আনন্দিত হইলেন, তিনি বুঝিলেন—সরসীবালাও তাঁহাকে ভালবাসে। তিনি বাড়ী, রাজধানী, রাজা, রণ সব মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিলেন, সেই সময় সরসীবালার অমিয়-মাখা মূর্ত্তিখানি তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল। তিনি ভালবাসায় ডুবিলেন। আবার শয্যায় শয়ন করিয়া ঐ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে শীতলাকান্ত রায় অতিথির নিকট আসিলেন। তখন উভয়ে দুর্গরক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। হংসেশ্বর রায় একজন অভিজ্ঞ সৈনিক, অতএব কি ভাবে রাজ্যের দ্বার রক্ষা পাইবে, তাহার সদুপদেশ দিলেন। রাজা দুর্গাধ্যক্ষকে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহার কৌশল ও কার্য্য-দক্ষতার অনেক পরিচয় পূর্ব্বে পাইয়াছেন তাহাও তিনি

বলিয়াছেন। দুর্গ-রক্ষকের প্রতি রাজার যে অটল বিশ্বাস আছে, হংসেশ্বর রায় তাহাও জানাইলেন। দুর্গাধ্যক্ষ আত্ম-প্রশংসা শ্রবণে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"দেখুন, এই সময় সৈন্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করিতে হইবে, বিপদের সময় অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে চলিবে না। তৎপরে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ রাজার নিকট একখানি পত্র লিখিলেন, সেই পত্র লইয়া অতি প্রত্যূষে হংসেশ্বর রায় রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজা ও রাণী।

রাজার অদর্শনে রাণী মলয়াবতী মৃত-প্রায় হইয়াছিলেন, তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরী অনেক বুঝাইত—অনেক সান্ত্বনা প্রদান করিত কিন্তু মনে মনে ভাবিত—মরিলেই মঙ্গল। ভুবনেশ্বরীর আশা পূর্ণ হইল না—তাহার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল—রাজা রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। রাণী আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সতীর পতিই জীবন, পতি না থাকিলে সতীর জীবন আশা থাকে না, রাণী মলয়াবতী পতিপ্রাণা ছিলেন, তিনি স্বামী-সমাগমে পুনর্জীবন লাভ করিলেন। রাজা ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে সভাসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, তারপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে আনন্দ-লহরী, রাণী সেই আনন্দোৎসব শুনিয়া মৃত্তিকা-শয্যা হইতে উঠিলেন, দেখিলেন সম্মুখেই তাঁহার আরাধ্য দেবতা। উভয়ে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেন, তারপর রাজা আত্ম-কাহিনী বলিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেবদাসের বিচার—তাহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা হইল। রাণী রাজাকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড কেন? তুমি কি হিন্দু রাজা নও?" রাজা হাসিয়া বলিলেন—"আজ এইভাবে থাক্, কাল যা হয় বলো। তাহার প্রাণদণ্ডের ত বিলম্ব আছে। আমার বিচারের উপর যদি আবার তোমার বিচার হয় তবে নারাজ, এবার হইতে প্রজাদিগকে বলিয়া দিব—তাহারা যেন এখানেই শেষ বিচারপ্রার্থী হয়।" রাণী ওষ্ঠযুগল ফুলাইলেন,তাঁহার অভিমান হইল। সেদিন আর কোন কথা হইল না, তৎপরদিবস সকলেই শুনিল—দেবদাসকে পাওয়া যাইতেছে না,সম্ভবতঃ রাত্রের মধ্যেই তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। রাণীর বড় রাগ হইল, তিনি রাজাকে বলিলেন—"এই বল্‌লে প্রাণদণ্ডের বিলম্ব আছে, আবার এ কি শুন্‌তে পাচ্ছি?" রাজা বলিলেন—"কি শুন্‌তে পাচ্ছ?" রাণী কোপসহকারে বলিলেন—"রাত্রেই নাকি দেবদাসের প্রাণদণ্ড করেছ? আমায় ঠিক ক'রে বল, ব্রহ্মহত্যা হ'লে আমি এ প্রাণ রাখ্‌ব না।" রাজা বড় বিপদে পড়িলেন, গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন না, রাণীও বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতএব ভাবিয়া বলিলেন—"দেবদাসের মৃত্যু হয় নাই, সে জীবিত আছে।" রাণী বলিলেন—"সে তবে কোথায়? সকলে একথা বল্‌চে কেন?" রাজা রাণীকে কখনও কটু কথা বলেন নাই, তিনি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন, কিন্তু অন্য কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। হাসি

হাসি মুখে বলিলেন—"বিচার বিষয়ে স্ত্রীলোকের হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।" রাণী আর কিছু বলিলেন না, তিনি রাগ করিয়া আহারাদি ত্যাগ করিলেন। রাজা কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

রাত্রি হইয়াছে, রাণী মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছেন, কেহই নিকটে আসিতে সাহস পাইতেছে না, এমন সময়ে রাজা আসিয়া ডাকিলেন—"প্রিয়তমে! একি ভাব? স্বর্ণলতা আজ ভূমিতে কেন?" রাণী কোন উত্তর করিলেন না। রাজা পুনরায় বলিলেন—"যদি কথা না কও, তবে আমি রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'যে যাবো।" এবার রাণী উঠিলেন, রাজার বক্ষ ধরিলেন। রাজা বলিলেন—"না, আমি আর সংসার করবো না। স্ত্রী যদি স্বামীর কথায় অবিশ্বাস করে, যদি সদাই অভিমানভরে থাকে, তবে সে স্বামীর জীবনে সুখ নাই।" রাণী বলিলেন—"স্বামিন্! তুমিই আমার গুরু, তোমাকে হারায়ে আমি জীবন হারায়েছিলেম। স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রতি অভিমান হয়ই, সেটী ভালবাসার চিহ্ন। আমাদের আর পৃথিবীতে কে আছে যার উপর আমাদের অভিমান শোভা পায়? স্বামীই আমাদের সর্ব্বস্ব। কিন্তু তুমি আমাকে অবিশ্বাস কচ্ছ কেন? আমাকে সব কথা খুলে বল না কেন?" এমন সময়ে উভয়ে দেখিলেন—এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাজা ও রাণী উভয়ে ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী রাণীকে বলিলেন—"মা! পতিব্রতা স্ত্রীর নিকট স্বামীর বাক্য বেদবাক্যবৎ,অবিশ্বাস করতে নাই। সতীর পতিই সর্ব্বস্ব—সতী-স্ত্রীর পতি ব্যতীত উপায় নাই। পৃথিবীতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্ম নাই, দেবতারা সেই ধর্ম্মের প্রশংসা করেন এবং পতিব্রতা স্ত্রীর নিকটে থাকিতে পারিলে জীবন স্বার্থক মনে করেন। তুমি পতিব্রতার আদর্শ, তুমি তাঁহাকে অবিশ্বাস ক'রে এরূপ অভিমান করলে চলবে কেন? মা! এক্ষণে তোমাদের সম্মুখে অনেক বিপদ, আমি চেষ্টা কচ্ছি যাহাতে সে বিপদ হ'তে তোমরা উদ্ধার পাও, তাহার উপর তোমরা নিজেরা যদি এরূপ কলহ আরম্ভ কর, তাহা হইলে ত কোন উপায় হইবে না। তুমি স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। এইমাত্র আমি বলছি—তোমার স্বামী নির্দ্দোষী, ব্রহ্মহত্যা হয় নাই—দেবদাস জীবিত আছে—তবে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করো না—আমার নিষেধ জানবে। আমি চল্লেম, আর কখনও সন্দেহের চক্ষে স্বামীকে দেখো না।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

রাণী বড় লজ্জিত হইলেন, তিনি স্বামীর পদযুগল ধারণ করিতে প্রস্তুত হইলে রাজা আদর করিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে টানিয়া লইলেন। রাণী বলিলেন—"প্রাণেশ্বর! আমার অপরাধ হ'য়েছে, ক্ষমা করলে ত?" রাজা বলিলেন—"তোমায় আবার ক্ষমা কি? গুরুর আদেশ ব্যতীত এ কথা আমি কাহাকেও বলতে পারতেম না, সেইজন্য তোমাকে বলি নাই। তুমি অভিমান করেছিলে, সে মান যে দুর হ'য়েছে এই আমার শুভাদৃষ্ট। তুমি ও আমি ভিন্ন নই, আমার প্রাণ ত অনেক দিন তোমাকে দিয়েছি।

আশা করি আর কখনও আমার উপর রাগ করবে না।" রাণী সন্তুষ্ট হইলেন, স্বামীর সোহাগে তিনি চিরকাল সুখী,আজ আরও সুখী হইলেন। তিনি স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া মনে মনে বলিলেন—"আমার মত সুখী কে? যার এমন দেবতুল্য স্বামী, তার আবার অভাব কিসের?" রাজাও আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"রাণি! একটী কথা তোমাকে বলি, কাহাকেও বিশ্বাস ক'রে কোন কথা ব'ল না। আমাদের অনেক শত্রু—মিত্রের সংখ্যা বড় কম। দেবদাস আমার জীবন বধের জন্য কত উপায় অবলম্বন করেছিল দেখ্‌লে ত? ভগবান যতদিন সহায় থাকবেন,ততদিন আমার অনিষ্ট হবে না। গুরুদেব আমার জন্য বহু পরিশ্রম কচ্ছেন। এখন এস, ছবির ঘরে যাই, তোমার ছবিটি রাত্রে আলোকে কেমন দেখাচ্ছে একবার দেখে আসি।" দুজনে তখন ছবির ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

সুপ্ত স্মৃতি।

সংসার কাননে ফুটেছিলে ফুল,
সৌরভে প্রাণ করিল আকুল!
সুখের স্বপনে মনে হ'ল যেন,
নিরবে ঝরিয়ে,
রেখেছ স্মৃতি,
হে সুন্দর, হে প্রীতি!

শুভ্র যূথিকার হৃদি মত তুমি,
আনন্দে আসিয়া এ জনমভূমি,
জনমের তরে রেখেছ জাগায়ে,
ব্যথিত অন্তরে,
তোমারি কীর্ত্তি,
হে সুন্দর, হে প্রীতি।

বন বিহঙ্গের মত নব রঙ্গে,
ছুটিয়া বেড়াতে ললিত ভঙ্গে;
কোকিল-কাকলি মুগ্ধ করে নর,
সে কি কভু জানে,
এ কিবা রীতি
হে সুন্দর, হে প্রীতি।

সংসার সাগরে উঠিতেছে কত,
পুনঃ মিশে যায় জলবিম্ব মত;
জগতের খেলা জগদীশ জানে,
উত্থান পতন,
জগৎ রীতি.
হে সুন্দর, হে প্রীতি।

জলদ কালিমায় নিরব কবি,
আঁকিয়ে রেখেছে তোমারি ছবি;
নিভৃতে বসিয়ে হৃদি-ছিন্ন তারে,
সুরে মিশাইছে,
বিষাদ গীতি;
হে সুন্দর, হে প্রীতি।

শ্রীসুধারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রমাদিত্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজপুতকুল।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যনৃপতিগণ যে, সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামক দুইটী মহদ্বংশ হইতে সমুদ্ভূত, তাহা হিন্দুমাত্রেরই বিদিত। কালক্রমে আর একটী বৃহৎ কুল উক্ত দুই কুলের সহিত সংযুক্ত হইল। সেই কুলটীর নাম

অগ্নিকুল। এই অগ্নিকুলের ভূপতিগণ একদা প্রচণ্ড প্রতাপ সহকারে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন; এমন কি সূর্য্য ও চন্দ্রকুলের পূর্ব্বতন গৌরবপ্রভা অনেক পরিমাণে ম্লান হইয়া পড়িলেও অগ্নিকুলসম্ভূত নরপতিগণের জ্বলন্ত মহিমায় ভারতভূমি উজ্জ্বলিত হইয়াছিল। এই তিনটী বিশাল রাজকুলের সহিত ক্রমে ক্রমে আরও তেত্রিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজকুল সংযুক্ত হইল। উক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ নৃপকুলের মধ্যে কয়েকটী বোধ হয়, বিশাল সূর্য্য ও চন্দ্রবংশতরুর শাখা-প্রশাখা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কালক্রমে এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বংশরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ধরিতে গেলে তন্মধ্যস্থ অধিকাংশ কুলের প্রতিষ্ঠাতৃগণ মুসলমানজাতির অভ্যুত্থানের অনেক পূর্ব্বে অভিযানোদ্দেশ্যে ভারতভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির উর্ব্বরতা এবং রমণীয়তাদর্শনে তাঁহারা স্বদেশের মমতা ভুলিয়া গেলেন এবং কালে এই বিদেশকে স্বদেশাপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া জ্ঞান করিলেন। কালক্রমে সেই সকল অভিযায়ীগণের অগ্রনায়কগণ স্ব স্ব নামানুসারে এক একটী স্বতন্ত্র কুল প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া এ মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিলেন। সেই সমস্ত ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে এস্থলে কেবল তিনটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজস্থান হইতে উদ্ধৃত হইল।

গ্রহলোট বা গিহ্লোট।—গিহ্লোটগণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া আপনাদের মহৎ কুলপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। রাজস্থানের ভট্টগণও তাঁহাদের সে মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন। মহারাজ সুমিত্রের পর অন্য কোন সূর্য্যবংশীয় নরপতির নাম কোন পুরাণে পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু এই গিহ্লোটগণ উক্ত সুমিত্র হইতে আপনাদের উদ্ভব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

কোন্ ঘটনাস্রোতে পতিত হইয়া কিরূপে যে ইহাঁদের পিতৃপুরুষগণ পবিত্র কোশলরাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়াই বা কোন্ কোন্ স্থানে আপনাদের বিশাল বংশতরুর শাখা-প্রশাখা রোপণ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের সমালোচনা করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঠিক কোন্ সময়ে যে, এই গিহ্লোটগণের আদি গোত্রপতি আপনাদের পিতৃপুরুষগণের পবিত্র লীলানিকেতন অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তাহা অনুমান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; তবে অনুশীলন দ্বারা এইমাত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শ্রীরাম চন্দ্রের বহুপুরুষ পরে অনুমান সম্বৎ ২০০ (খ্রীঃ ১৪৪) অব্দে—কনকসেন নামা জনৈক সূর্য্যবংশীয় নৃপতি আপনাদের পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৌরাষ্ট্রে আগমন করিয়া আপনার পিতৃপুরুষগণের বিশাল বংশতরু রোপণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা টড বলেন, রাজ্যধনে বঞ্চিত হইয়া পাণ্ডবগণ যে বিরাটনগরে আত্মগোপন পূর্ব্বক অজ্ঞাতবাসকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর মহারাজ কনকসেন সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া সেই বিরাটপুরে আপনার অভিনব রাজপাট স্থাপন করেন। তৎপরে কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে বিজয়সেন নামা

তদীয় জনৈক বংশধর উক্ত প্রদেশে বিজয়পুর * নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ কনকসেনের বীরকুলজাত নৃপতিগণ অনেক দিন ধরিয়া সেই প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিলেন। তথায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে "বালকরায়" নামে পরিচিত হইলেন। কি সূত্রে এবং কোন্ কারণবশতঃ যে, সূর্য্যকুলতিলক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ "বালকরায়" উপনাম প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অনুমান করা কঠিন। যাহা হউক, উক্ত উপাধি তাঁহারা প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বহন করিয়াছিলেন।

কালস্রোতের অনিবার্য্য প্রভাবানুসারে সৌরাষ্ট্রে সূর্য্যবংশীয় বালকরায়দিগের লীলাখেলার ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। অবশেষে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রাক্কালে তাঁহাদের শেষ রাজা মহারাজ শিলাদিত্য ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সমরে নিহত হইলে, উক্ত প্রদেশ হইতে সূর্য্যকুলের বংশতরু উৎপাটিত হইল। তৎপরে তাহা তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী ইদর নামক স্থানে পুনঃরোপিত হইয়াছিল। তথায় গ্রহাদিত্য নামা তদ্বংশজাত জনৈক নরপতি কিছুকালের জন্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই গ্রহাদিত্য হইতেই মহারাজ কনকসেনের বংশধরগণ "গ্রহলোট" অথবা "গিহ্লোট" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

কতিপয় বৎসর অতীত হইলে গিহ্লোটগণ ইদর পরিত্যাগ করিয়া আহর নামক স্থানে গমন করিলেন। তদনুসারে গিহ্লোট নামের পরিবর্ত্তে তাঁহারা আহার্য্য নাম ধারণ করিলেন এবং এই অভিনব অভিধায় কিছুকাল পরিচিত হইয়া আসিলেন; কিন্তু অচিরে ঐ নূতন আখ্যার পরিবর্ত্তে শিশোদীয় নাম প্রচলিত হইল। এই শিশোদীয় বংশাখ্যাই কালে বলবতী হইয়া উঠিল। সম্পদে বিপদে—অদৃষ্টচক্রের অবিরাম পরিবর্ত্তনেও সে শিশোদীয় নাম আর পরিবর্ত্তিত হইল না। একদিন যে নৃপতিগণ আপনাদের প্রচণ্ড প্রতাপে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে এবং ভারতীয় নরপতিগণের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় হইয়া যে শিশোদীয় আখ্যাকে জ্বলন্ত গৌরব-গরিমার আদর্শ স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজি দুর্ভাগ্যের নিম্নতম কূপে পতিত হইয়াও তাঁহাদের বর্ত্তমান হতভাগ্য বংশধরগণ সেই শিশোদীয় আখ্যাতেই পরিচিত হইতেছেন।

শিশোদীয় নাম যদিও সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ বলবৎ হইয়াছে, তথাপি রাজস্থানের ভট্টকবিগণ ইহাকে গিহ্লোটের একটী শাখা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

গিহ্লোটকুল সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। উক্ত চব্বিশটী শাখার মধ্যে আহার্য্য ও শিশোদীয়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যাদব—মহারাজ যযাতি যদিও জ্যেষ্ঠতনয় যদুকে ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্যে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠ পুরুকেই তাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি কালক্রমে যদুরই বংশধরগণ বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিলে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে বহির্গত হইয়াছিলেন, সঙ্গে যদুকুলতিলক কৃষ্ণেরও অবশিষ্ট বংশধরগণ তাঁহাদের

* ইহা সর্ব্বদা বিজয়পুর বিরাটগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অনুগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া পঞ্চনদ ক্ষেত্রের দোয়াবের * গিরিপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া কিছু-কাল তথায় অতিবাহিত করেন; কিন্তু তৎ-প্রদেশে সকল বিষয়ের অসুবিধা হওয়াতে সেই শৈল-মণ্ডিত ভূভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধুনদের পরপারস্থ জাবালিস্থান নামক প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইলেন এবং তথায় আপনাদের রাজপাট স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রসিদ্ধ গজনী নগরী প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই জাবালিস্থানে যাদব-গণের আধিপত্য দৃঢ়সংস্থাপিত হইয়াছিল। একদা তাহা সুদূর সমরখণ্ড পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল; কিন্তু বিধিলিপির অবশ্যম্ভাবী বিধানানুসারে তাঁহারা চিরকাল তথায় রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা তৎপ্রদেশ হইতে আগমন করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কোন্ দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বংশ-ধরগণ যে, পুনর্ব্বার ভারতে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, তাহার স্থিরীকরণ অসম্ভব। তদ্বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকগণ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের সার সঙ্কলন করিলে এইমাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলেকজন্দারের পরবর্ত্তী গ্রীকনৃপতি-গণ তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ, যে কারণবশতঃই হউক, যাদবগণ যে, কোন একটী দৈবদুর্ঘটনা-বশতঃ ভারতবর্ষে পুনঃপ্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা ভট্টদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

ভারতভূমিতে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া যাদবগণ পাঞ্জাবে অবস্থিত হয়েন এবং তথায় শালভানপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন; কিন্তু সে নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। অচিরে শত্রু কর্ত্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা রাজস্থানের বিশাল মরুক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। লঙ্গহ, জোহিয়া ও মোহিল প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতি তৎকালে তথায় বাস করিত। যাদবগণ তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ক্রমা-ন্বয়ে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তথায় তাঁহারা অনেক-গুলি নগর স্থাপন করিলেন। সেই সকল নগরের মধ্যে কেনোট, দরওয়াল ও যশল্মীরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। *

দৈবদুর্ব্বিপাকের প্রচণ্ড প্রভাবে জাবালিস্থান হইতে দূরীকৃত হইয়া যখন যাদবগণ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন তাঁহারা অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। সে

* তাঁহারা যে গিরিব্রজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সিন্ধুনদের দোয়াবে স্থাপিত; আজিও তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণ তাহাকে "যদুকাডাঙ্গ" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

* সম্বৎ ১২১২ (খৃঃ ১১৫৬) অব্দে যশল্মীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত নগর প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা কোন প্রাচীন জাতির হস্ত হইতে লোদুর্ব্বাপত্তন নামক নগর আচ্ছিন্ন করিয়া তথায় কিছু কালের জন্য অবস্থিত হইয়া-ছিলেন।

সকল গোত্রের মধ্যে ভট্টিই বিশেষ পরাক্রান্ত। কালক্রমে উক্ত ভট্টিই যদুকুলের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যদুকুলের আর একটী প্রসিদ্ধ শাখার নাম জারিজা। ইহা উক্ত কুলাখ্যান গ্রন্থে ভট্টির অব্যবহিত নিম্ন আসনেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুইটী শাখা সম্বন্ধে ঠিক এক প্রকার বিবরণই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভট্টগণ বলেন এতদুভয়ই শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যদুকুল ধ্বংসের পর ঠিক এক সময়েই এতদুভয় শাখার অগ্রনায়কগণ হতাবশিষ্ট যাদবগণ সমভিব্যাহারে ভারতের পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টির ন্যায় জারিজা আপনার রাজত্ব অধিকদূর বিস্তৃত করিতে সক্ষম হন নাই। সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে শিবস্থান নামে একটী জনপদ অবস্থিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, জারিজাগণ সেই শিবস্থানেই আপনাদের অধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে, তথায় অনেক দিন ধরিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতাপসহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা অলেকজন্দারের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তৃগণের প্রণীত গ্রন্থসমূহে একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, মাকিদোনীয় মহাবীর যৎকালে অভিযানোদ্যত হইয়া ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন, তখন উক্ত জারিজা-কুলসম্ভূত শাম্বনামধেয় জনৈক নৃপতি তাঁহার প্রতিকূলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ শাম্বের পতাকামূলে যে সমস্ত সৈন্য-সামন্ত সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই হরিকুলোৎপন্ন। সে সময়ে তাঁহাদের অবস্থা যদিও অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি যতদূর সাধ্য তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন গৌরবের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল।

মহারাজ শাম্ব শ্যামনগরে রাজত্ব করিতেন; কিন্তু গ্রীকগণ উক্ত শ্যামনগরের পরিবর্ত্তে মীনগড় অভিধা প্রদান করিয়াছে।

অনর্থকর ভীষণ অন্তর্বিপ্লবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বংশ অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সেই কালস্বরূপ অন্তর্বিগ্রহ হইতে যে কতিপয় যাদব জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও সামান্য নহে। তাঁহাদের প্রত্যেকের বংশ কালক্রমে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আজি ভারতের অনেক স্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যদুকুল সর্ব্বসমেত আটটী শাখায় বিভক্ত, সেই আট শাখার মধ্যে ভট্টি ও জারিজাই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্।

তুয়ার।—অনেকে তুয়ারকে যদুকুলের অন্যতম শাখা বলিয়া গণনা করেন; কিন্তু মহাকবি চাঁদভট্ট ইহাকে মহারাজ পাণ্ডুর একটী শাখাকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ দুইটীর মধ্যে কোনটী যে বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ, তাহা অনুমান করা কঠিন। কেননা এতৎকুলের নামকরণসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ হেতুবাদই দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক, এসকল বিষয় ছাড়িয়া দিয়া যদি ইহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বিষয় সমক্‌রূপে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে

ইহাকে রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশৎ রাজকুলের মধ্যে একটী উচ্চ আসন দান না করিয়া থাকা যাইতে পারে না।

সে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি যে দুই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাঁহাদের পবিত্র নাম আজিও প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের জপমালাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আজিও হতভাগ্য হিন্দু-সন্তানগণ সেই পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে আপনাদের উপস্থিত দুরাবস্থার বিষয় ভুলিয়া যায় এবং অতীতের গভীর যবনিকা ভেদ করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদের সেই স্বর্গীয়-সুখময় রাজত্বকালে বিচরণ করিতে থাকে। সে কাল ভারতের স্বর্ণযুগ; ভারত তখন জগন্মান্য পণ্ডিতবর্গে অলঙ্কৃত হইয়া সমস্ত সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তুষারকুলোৎপন্ন সেই দুইটী মহাপুরুষের মহনীয় চরিত্রগুণে ভারতে দুইটী নূতন গৌরবান্বিত যুগের অবতারণা হইয়াছিল। সেই দুই মহাপুরুষ, প্রথম—হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী উজ্জয়িনীনাথ মহারাজ বিক্রমাদিত্য; দ্বিতীয়—হিন্দুরাজকুলতিলক দিল্লীশ্বর মহারাজ অনঙ্গপাল। কুরুক্ষেত্রের মহাশোণিতহ্রদে আর্য্যগৌরব-রবি নিমগ্ন হইলে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষাদ-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকার-রাশি দূর করিয়া সেই অস্তমিত আর্য্যগৌরব-তপনের আদর্শস্বরূপ কোন্ মহাপুরুষ অমরাবতী সদৃশ অবন্তীর সিংহাসনে উত্থিত হইয়াছিলেন? কাহার কীর্ত্তিভাতি ও গৌরবগরিমায় সমগ্র ভারতবর্ষ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল? কে না বলিবে—কে না স্বীকার করিবে, সেই মহাপুরুষ রাজাধিরাজ মহারাজ বিক্রমাদিত্য? মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আজ অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার সামান্য চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই। যেদিন তিনি এই পুণ্যধাম ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া একটী স্বর্ণযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে আজি কতশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে;—ভারতভূমির হৃদয়ের উপর কত বিপ্লবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; কত বিদেশীয় বিজাতীয় নরপতি ভারতসন্তানগণের অদৃষ্টচক্র নিয়মন করিয়া আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের নামাবলি—তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ অধিকাংশই তাঁহাদের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পবিত্র নাম কয়জন হিন্দুসন্তান ভুলিতে পারিয়াছেন? ভুলিতে পারিবে কি?—বলিতে পারি না। যেদিন জগতে সংস্কৃতশাস্ত্রের নাম উঠিয়া যাইবে—যেদিন তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্বৎ ভারতে কালচক্রের এক একটী আবর্ত্তন নির্দ্দেশ করিতে বিরত হইবে, সেই দিন ভুলিবে কিনা বলিতে পারি না—সেই দিনের বিষয় কল্পনা করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে?

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় শিক্ষার অবনতি।

ভারতবাসীর শিক্ষা বিপর্য্যয় খুবই ঘটিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে

উচ্চশিক্ষায় পথ রুদ্ধ হয় এবং সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর (mass education) বালকগণের মধ্যে রবিরশ্মির ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল শিশুগণের শিক্ষাসমস্যা দিন দিনই যেন জটিল হইতে জটিলতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এই শিশু-শিক্ষা সমস্যার সমাধান কল্পে আমাদের আর অমনোযোগী থাকিলে চলিবে না। আমাদের সুকুমার শিশুগণের কোমল মস্তিষ্কের উপর আজকাল রাশি রাশি গ্রন্থের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে বটে কিন্তু তাহাতে তাহাদের উপকার না হইয়া বরং অপকারই বেশী হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপ তীক্ষ্ণ মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ, শিশুগণের মধ্য হইতে যেন আর বড় বাহির হইতেছে না। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, হেমচন্দ্র, নবীন প্রভৃতি অসীম প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমকক্ষ একটী লোকও ত আর এদেশে জন্মগ্রহণ করিতেছে না। অতীতের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, বর্ত্তমানযুগের স্যার আশুতোষের ন্যায় অসাধারণ ধীমান্ ও অনন্যসাধারণ মেধাসম্পন্ন পুরুষও সমগ্র দেশ খুজিলে আর একটী মিলে না। এইরূপ অবস্থার কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিবার দিন আসিয়াছে। আর নিশ্চষ্ট থাকিলে চলিবে না। শিশু-শিক্ষার প্রতি উদাসীন হইয়াই বঙ্গসমাজের এই শোচনীয় অবস্থা! Child is the Father of Man—শিশুই মানব-জাতির পিতা বা ভাগ্যবিধাতা। সকল জাতির ভবিষ্যতের ভরসাই শিশুগণ। কেননা শিশুরা ত চিরকাল শিশু থাকিবে না, বড় হইয়া তাহারাই সমাজের নিয়ন্তা ও ভাগ্যবিধাতা হইয়া নানারূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ ও ভীষণ সমস্যার সমাধান করিবে। সুতরাং শিশুগণের শিক্ষা বিষয়ে আমাদের আর অমনোযোগী থাকা শোভা পায় না। শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া এবং গৃহ-শিক্ষক রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই চলিবে না। প্রত্যেক পিতা মাতা ও অভিভাবকগণকে নিজে প্রস্তুত হইয়া আজ স্বহস্তে শিশুগণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। শিশুগণকে যথার্থ মানুষে পরিণত করিতে হইলে তাহাদিগকে দিয়া কেবল পাঠের বোঝা বহন করাইলেই চলিবে না। কোন্ পাঠ্যে কি বস্তু আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। পাঠ্যের বোঝাও কমাইয়া দিতে হইবে। পাঠ্যের বোঝায় বিব্রত হইয়া পড়ায় শিশুরা পাঠ্যের রসাস্বাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। পাঠ্যের নামে কত অপাঠ্য যে আজ শিশুগণের মস্তক চর্ব্বণ করিতেছে, তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। ছেলেদের জন্য নিত্য নূতন পাঠ্য বই বাহির হইতেছে, অথচ তাহাদের নিত্য নূতন জ্ঞানোদয় হইতেছে না। শিশুশিক্ষা, বোধোদয়, বাল্যশিক্ষা, পদ্যমালা, কোমল কবিতা, কথামালা, হিতোপদেশ প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থের একখানা মাত্র পাঠ করিলে পূর্ব্বে শিশুদের যে জ্ঞানোদয় হইত, আজ ১৫।২০ খানা নূতন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়াও সেইরূপ জ্ঞানোদয় হয় না। কত

কিম্ভূতকিমাকার অপাঠ্য কুপাঠ্য যে আজ শিশু পাঠ্যরূপে সুকুমার শিশুগণের অস্থিচর্ব্বণ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

এদেশে কথাসাহিত্যে এক সময় অতি সুন্দর রূপে শিশু শিক্ষা হইত। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যও এক সময় কথাসাহিত্যে ভরপুর ছিল, আজও যে নাই—তাহা নহে,কিন্তু শিশুসাহিত্যে তাহার ঠাঁই যেন কম। আমাদের কথা সাহিত্যের রাজা ছিলেন—বিষ্ণুশর্ম্মা। ইতর জন্তুর মুখে নানারূপ দুর্লভ বচন সকলের সমাবেশ করিয়া তিনি কেবল যে শিশুগণেরই সুশিক্ষা এবং চিত্তহরণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—তাহা নহে,যুবক, বৃদ্ধগণেরও নৈতিক দৈন্য পূরণের পথ পরিস্কার করিয়া গিয়াছেন। মনে হয়,—দীর্ঘশ্মশ্রু ধর্ম্মাচার্য্যগণের সুদীর্ঘ বক্তৃতা, বিষ্ণুশর্ম্মা বর্ণিত অজপুত্রগণের সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উপদেশের কাছে যেন দাঁড়াইতে পারিতেছে না। পশুর কথায় শতবর্ষ ধরিয়া আমাদের শিশুরা মানুষ হইতেছে। সকল দেশের সকল ভাষাই কথাসাহিত্যে আজ ভরপুর। বিষ্ণুশর্ম্মার নিকট এ বিষয়ে বহু জাতি যে ঋণী—তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মহাভারতের কথাসাহিত্য হিন্দু জাতির সর্ব্বস্তরে কত অমূল্য রত্ন যে ছড়াইয়া রাখিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করে? প্রাচীনকালে এদেশে এত পাঠ্যের বোঝা ছিল না। আমাদের দেশের মা মাসী ও দিদিমাদের মুখে কথাসাহিত্যের অতি সুন্দর বিকাশ হইয়াছিল। আর যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতিতেও তাহার বিকাশ হইত। আজকাল তাহার আর বেশী কিছু নাই। সে মা-মাসীরাও নাই, সে দিদিমাও নাই। সে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতাও তেমন নাই। শিশুশিক্ষার সে প্রণালী অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন মা মাসীর স্থান অধিকার করিয়াছেন—নিত্য নূতন পাঠ্য গ্রন্থ! কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহোদয় সঙ্কলিত "ঠাকুরমার ঝুলি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় যথার্থ বলিয়াছেন—"পাল-পার্ব্বণ, যাত্রা, গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক-বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে, তারপর দেশের শিশুরাও কোন্ পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল! তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এত নীরব কেন! তাহাদের পড়া-ঘরের কেরোসিন-দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায়, তাহাতে কেবল বিলাতী বানান বহির বিভীষিকা! মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে! কেবলই বইয়ের কথা! স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল!—দেশ-লক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়!" ইত্যাদি। "ঠাকুরমার ঝুলির" সুযোগ্য লেখক বলেন—"একদিনের কথা মনে পড়ে,দেবালয়ের আরতির বাজনা বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, মার আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা শুনিতেছিলাম।

"সে কেন কেমন—কতই সুন্দর! পড়ার বইখানি হাতে নিতে নিতে ঘুম পাইত; কিন্তু সেই রূপকথা তা'রপর তা'রপর তা'রপর করিয়া কত রাত জাগাইয়াছে! তা'রপর শুনিতে শুনিতে চোখ বুজিয়া আসিত;—সেই অজানা রাজা, সেই অচেনা রাজপুত্র, সেই সাতসমুদ্র তের নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত;—আমার মত দুরন্ত শিশু!—শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

বাঙ্গালার শ্যামপল্লীর কোণে কোণে এমনি আনন্দ ছিল, এমনি আবেশ ছিল। মা আমার অফুরন্ত রূপকথা বলিতেন।—জানিতেন বলিলে ভুল হয়, ঘরকন্নার রূপকথা যেন জড়ানো ছিল; এমন গৃহিণী ছিলেন না যিনি রূপকথা জানিতেন না,—না জানা যেন লজ্জার কথা ছিল! কিন্তু এত শীঘ্র সেই সোণা-রূপার কাটি কে নিল,আজ মনে হয়, আর ঘরের শিশু তেমন করিয়া জাগে না, তেমন করিয়া ঘুমিয়াও পড়ে না!" ইত্যাদি।

হায়, সে দিন আবার ফিরিবে কিনা কে জানে? আজকাল অনেক ভূতের গল্প, আজগুবি কাহিনী, হাসি খুসির কথা লইয়া শিশুদের জন্য পাঠ্য রচিত হইতেছে। ইহাতে ভূত প্রেত সম্পর্কে নানারূপ অন্ধ বিশ্বাস ছেলেদের মনে গাঁথিয়া যাইতেছে। ছেলেরা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার কিছু পাইতেছে না। নানারকমের পুস্তক বাহির হইতেছে বটে কিন্তু ছেলেরা তাহাতে বিশেষ কিছুই ত পায় না। অনেক স্থলেই ছেলেদের হাসাইয়া, তরল আজগুবি কথায় তাহাদের চমকাইয়া পুস্তকের কাট্‌তি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। রাশি রাশি ছবির গ্রন্থ বাহির হইতেছে, ছবির পারিপাট্যে ছেলে ভুলান হইতেছে, কিন্তু তাহাতে ছেলেদের স্থায়ী উপকার হইতেছে না। লেবেন্‌চুষ সাময়িক মুখরোচক হইতে পারে, কিন্তু এ কথা ভুলিলে বিপদ হইতে পারে যে, আর কিছু না দিয়া লেবেন্‌চুষ খাওয়াইলে ছেলে বাঁচে না। আমাদের বর্ত্তমান শিশু-সাহিত্যেও এ কথাটী বেশ খাটে। শিশুদিগের শিক্ষার জন্য স্থায়ী ও পুষ্টিকর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। পৃথিবীর নানা বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি অতি সরল ও সরস ভাষায় লিখিত হওয়া চাই। তবেই শিশুদের উপকার হইবে, নচেৎ নহে। দেশের সহৃদয় সুশিক্ষিত লোকেরা এই কার্য্য-ভার গ্রহণ করুন। নতুবা আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

আমাদের দেশের কৃষকপুত্রগণ সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া আত্ম-সম্মান-জ্ঞানে আপ্লুত হইয়া আর কৃষিকর্ম্ম করা অপমান বোধ করেন এবং দাসত্ব-রূপ চাকুরীর জন্য নগরে আসিয়া লালায়িত হইতে থাকেন? এখন আমাদের পাশ্চাত্য কৃষকদের মত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কৃষি-কার্য্য হেয় না ভাবিয়া জমীদার ও কৃষক বালকগণের একযোগে কৃষিকর্ম্মে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়া কৃষি-বৃত্তিতেই মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের কৃষকগণ Dignity of labourএর সার্থকতা বুঝিয়া কাজ করেন না, তাই আমাদের দেশের কৃষির এত অবনতি, এবং অধোগতি হইয়াছে ও হইতেছে। চিন্তা-স্রোতের বিকৃতির সহিত জাতীয় জীবনও কলুষিত হয়। চিন্তার বহিঃপ্রকাশ সাহিত্যে।

সাহিত্যেও আমাদের সেইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। চণ্ডীদাস,জয়দেব, ভবভূতি, বিদ্যাপতি প্রভৃতির ন্যায় কয়জন কবি জন্মিয়াছেন? জাতীয় চিন্তার বহিঃপ্রকাশ জাতীয় সাহিত্যে। আমাদের চিন্তা-শক্তিতে ভাঁটা পড়িয়াছে; সাহিত্যে অবনতি ঘটিয়াছে; তাহার প্রমাণ আজকালকার বহুল চুটকী নবেল, নাটক, গল্পের সংবাদপত্রাদি ও মাসিক পত্রিকার প্রচার। জাতীয় কলুষিত চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত করিবার ইহাই একমাত্র যন্ত্রস্বরূপ। এই অবনতির প্রধান কারণ আমাদের ধর্ম্মাভাব। এ সম্বন্ধে সে দিন ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ সংবাদপত্রে একটী বেশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার আংশিক উদ্ধৃত করিয়া পাঠকপাঠিকাগণের চিত্ত-বিনোদন সম্পাদনের প্রয়াসী হইব।

ভারতীয় আর্য্য-সমাজের বর্ত্তমান অবনতির কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত থাকিলেও আমরা স্থূলতঃ দেখিতে পাই, মানব-হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাব যতই হীনতাপ্রাপ্ত হইতেছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিবর্ত্তে, ঐহিক উন্নতি ও ভোগ-বিলাস যতই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া সামাজিক ব্যক্তিবর্গের হৃদয় অধিকার করিতেছে, ততই অবনতির কারণ-সমূহ আত্ম-বিস্তার করিয়া, সমাজ-শক্তিকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া তুলিতেছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই প্রধান লক্ষ্যস্থল স্থির করিয়া তদনুকূল ভাবে সামাজিক ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই, তাঁহারা সমাজের বন্ধন-সমূহ এতাদৃশ দৃঢ়ীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জাগতিক সুখ-সম্পদ চিরস্থায়ী নহে, ইহা তাঁহারা বুঝিয়া-ছিলেন বলিয়াই মানবসমাজ ধর্ম্মভাবে, ত্যাগের আদর্শে ও সংযমের কঠোর শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়া-ছিলেন—যাঁহারা বাস্তবিক ধর্ম্মাত্মা ও সংযমী, তাঁহারাই সমাজ-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অসংযমী অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মানব-সমাজের ঘোরতর শত্রু। সুতরাং অধর্ম্ম যাহাতে কোন মতে সমাজ-শরীরে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে, তাদৃশ রীতিসমূহকেই তাঁহারা সমাজের রীতিনীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের দৃঢ় ধারণা—আর্য্য-সমাজ যদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধ-বিরহিত হইত, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্ব কখনই এত সুদীর্ঘ কাল ব্যাপক হইতে পারিত না।

কাল-চক্রের কুটিলাবর্ত্তনে সেই মহান্ আর্য্য ধর্ম্ম আজ অতল জলে ডুবিতে বসিয়াছে! প্রাচীন তত্ত্বদর্শী, আর্য্য-ঋষিগণ যোগবলে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া যাহা ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। অধুনা পাশ্চাত্য ভোগ-বিলাস-বিলোলা সভ্যতা ও বিজাতীয় অর্থকরী বিদ্যার প্রভাবাবিষ্ট কত ধুরন্ধর যে সেই সনাতন, ধর্ম্মপ্রাণ, ত্রিকালদর্শী ঋষি প্রণীত অমূল্য শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া দেশ ও সমাজকে যথেচ্ছাচারের নারকীয় লীলা-ভূমি করিয়া তুলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য। মহাস্বার্থপর ও শিশ্নোদরপরায়ণ অদূরদর্শিগণ নিত্য-নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া সমাজের ও সনাতন-ধর্ম্মের মূলে যে কি নিদারুণ